১০ই নভেম্বর স্মরণে

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

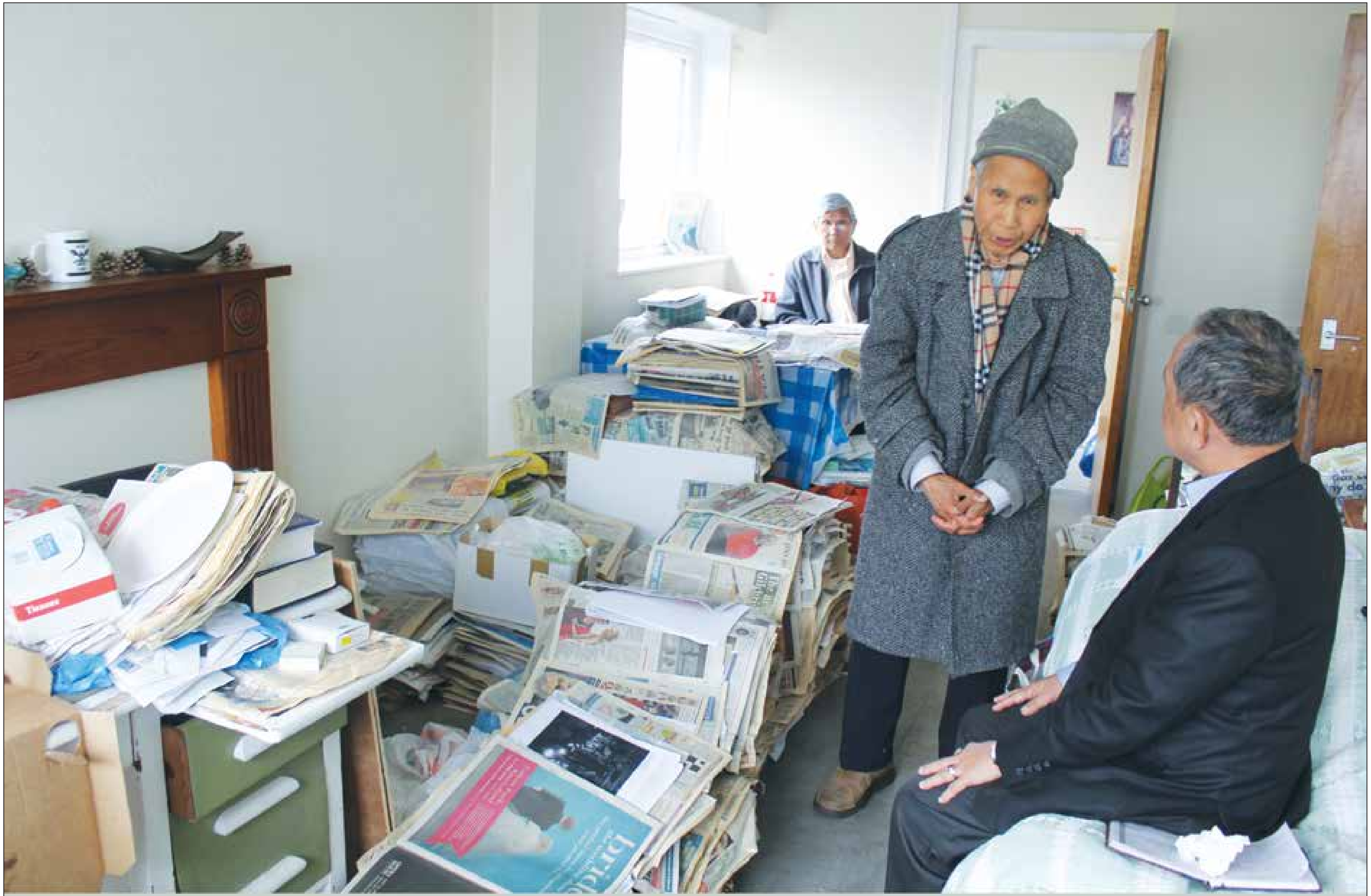

বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন ও সরকারের সাথে আদান-প্রদানের দলিলপত্রাদি (পত্রিকা কাগজ মুড়িয়ে সযত্নে সংরক্ষিত) সমেত
ড. আর এস দেওয়ানকে তাঁর ম্যানচেস্টারের এ্যাপার্টমেন্টে উষাতন তালুকদারের সাথে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে।

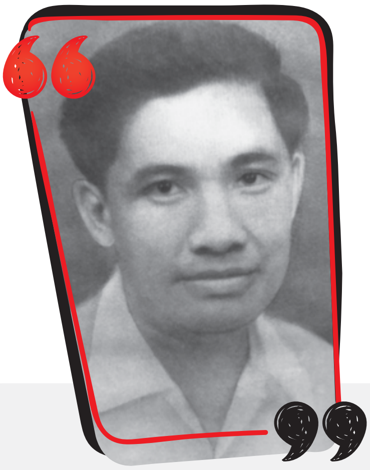

১০ই নভেম্বর স্মরণে

প্রকাশ:
১০ নভেম্বর ২০২১

প্রকাশনায়:
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি
ফোন: +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮
ই-মেইল: pcjss.info@gmail.com
ওয়েব: www.pcjss.org

মূল্য: ১০০ টাকা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ০৪

প্রবন্ধ ০৫-৪৪
মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা: জুম্ম জাতির স্থপতি– মিতুল চাকমা বিশাল ০৫
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি: রক্তাক্ত শান্তির শ্বেত কপোত– বিজয় বিকাশ ত্রিপুরা ১১
জুম্মদের জাতিগত নির্মূলীকরণ ষড়যন্ত্রের পাঁচ দশক- নিপন ত্রিপুরা ১২
জাতি ও জাতীয়তা সম্পর্কে– ক্যবামং মারমা ২১
পাহাড়ের তরুণদের স্বপ্ন– সঞ্জীব দ্রং ২৬
জাতিগত নির্মূলীকরণ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা: প্রাসঙ্গিক ভাবনা- শ্রী অমরজিৎ ২৯
পার্বত্য চট্টগ্রাম, আদিবাসী আন্দোলন এবং এম এন লারমা: নিজস্ব অভিজ্ঞতার বয়ান- মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম ৩৩
এম এন লারমার সংগ্রাম শেষ হয়নি– সোহরাব হাসান ৩৮

কবিতা ৪০-৪১
ন চাং যেবার এ জাগান ছাড়ি– হাফিজ রশিদ খান ৪০
প্রতিজ্ঞা– শৈলেন চাকমা ৪০
মহান নেতা– শান্তি দেবী তঞ্চঙ্গ্যা ৪১

ড. আর এস দেওয়ানকে স্মরণ ৪২-৬৯
ড. আর এস দেওয়ানের স্মরণে– জ্যোতিপ্রভা লারমা ৪২
ড. আর এস দেওয়ান ছিলেন জুম্ম জনগণের দূত: স্মরণসভার বক্তারা ৪৩
ড. আর এস দেওয়ানের আত্মত্যাগ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে অনুপ্রেরণা যোগাবে: স্মরণসভায় বক্তারা ৫১
ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ানের স্মরণে আন্তর্জাতিক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা ৫৫

সম্পাদকীয়

জুম্ম জাতির জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা এবং সাবেক সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৩৮তম মৃত্যুবার্ষিকী এবং জুম্ম জাতীয় শোক দিবস। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জাতি এবং সর্বোপরি দেশের সকল নিপীড়িত জাতি ও মানুষের জন্য এ এক গভীর শোকাবহ ও তাৎপর্যময় দিন। ১৯৮৩ সালের এই দিনে দিবাগত রাতে পার্টির অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা সুবিধাবাদী, উচ্চাভিলাষী ও ক্ষমতালিপ্সু গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের এক বিশ্বাসঘাতকতামূলক সশস্ত্র আক্রমণে গুলিবিদ্ধ হয়ে আটজন সহযোদ্ধাসহ শাহাদাৎ বরণ করেন জুম্ম জনগণের প্রাণের মানুষ, মহান বিপ্লবী নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা।

একের পর এক বিজাতীয় শাসকগোষ্ঠীর নির্মম ও বর্বরোচিত দমন-পীড়নে জর্জরিত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব যখন চরম অবলুপ্তির পথে ধাবিত হচ্ছিল, ঠিক তখনি তিনি মুক্তির অগ্নিমন্ত্র নিয়ে জুম্ম জাতিকে প্রগতিশীল জুম্ম জাতীয়তাবাদী চেতনায় জাগরিত করে ঐক্যবদ্ধ করেন। তাঁরই নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের প্রথম ও একমাত্র লড়াকু রাজনৈতিক পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এম এন লারমা জুম্ম জনগণের পাশাপাশি বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, মাঝি-মাল্লা তথা সমাজের অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষের স্বার্থে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ভিতরে ও বাইরে আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি ছিলেন নারী অধিকারের একজন বলিষ্ঠ প্রবক্তা। তাই তিনি সত্যিকার অর্থে মানবতাবাদী মহান এক নেতা।

তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাঁর সংগ্রামী চেতনা ও চিন্তাধারা এবং তাঁর অনুসরণীয় কাজের দৃষ্টান্ত আজ আমাদের অমূল্য সম্পদ এবং জুম্ম জনগণসহ বিশ্বের মুক্তিপাগল নিপীড়িত মানুষের বিপ্লবী সংগ্রামের পাথেয় হয়ে থাকবে। জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে দীর্ঘ আড়াই দশক ধরে প্রতিনিয়ত কঠিন প্রতিকুলতার মুখে সশস্ত্র আন্দোলন করতে গিয়ে নিজেদের অমূল্য জীবনদান করে গেছেন পার্টির শত শত কর্মী ও বীরযোদ্ধা। সশস্ত্র আন্দোলনের পাশাপাশি চলমান গণআন্দোলনে সামিল হয়ে বীরত্বের সাথে শাহাদাৎ বরণ করেছেন মুক্তিপাগল অসংখ্য মানুষ। ১৯৯৭ সালে সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের পর সেনাবাহিনী তথা শাসকগোষ্ঠীর মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর আক্রমণে নির্মমভাবে খুন হয়েছেন অনেক বিপ্লবী ও অধিকারকামী ব্যক্তিবর্গ। আজ এই জাতীয় শোক দিবসে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মহান নেতা এম এন লারমাসহ মহান বীর শহীদদের অমূল্য অবদান ও অমর আত্মবলিদান গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে।

এম এন লারমার গড়ে তোলা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাকার আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর চুক্তির কিছু ধারা-উপধারা বাস্তবায়িত হলেও এখনো দুই-তৃতীয়াংশ ধারা অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে।

শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকার, যে সরকার ১৯৯৭ সালে জনসংহতি সমিতির সাথে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল, সেই সরকার ২০০৯ সাল থেকে দীর্ঘ এক যুগের অধিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেও, চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেনি। ফলে বিগত ২৪ বছরেও পার্বত্য সমস্যার কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক সমাধান হওয়া তো দূরের কথা, সমস্যা আরো জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে। পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের পরিবর্তে বর্তমান সরকার পূর্ববর্তী স্বৈরশাসকদের মতো সামরিক উপায়ে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের পথ কার্যত বেছে নিয়েছে। তদুদ্দেশ্যে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিকায়ন জোরদার করেছে।

জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকসহ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে সোচ্চার ব্যক্তি ও সংগঠনকে 'সন্ত্রাসী', 'চাঁদাবাজ', 'অস্ত্রধারী দুর্বৃত্ত' হিসেবে পরিচিহ্নিত করার জন্য ব্যাপক অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম জোরদার করেছে বর্তমান শেখ হাসিনা সরকার। পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে সেনা অভিযান, ঘরবাড়ি তল্লাসী, গ্রেফতার, ক্রশফায়ারের নামে বিচার-বহির্ভুত হত্যা, ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের, অনুপ্রবেশ, ভূমি বেদখল, চুক্তি বিরোধী অপপ্রচার ইত্যাদি মানবতা ও জুম্ম স্বার্থ বিরোধী কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের এমনিতর শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে, আসুন, মহান বিপ্লবী নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নীতি-আদর্শ ও সংগ্রামী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে জুম্ম জনগণের ইস্পাত-কঠিন জাতীয় ঐক্য-সংহতি জোরদার করি, শাসকগোষ্ঠীর সকল ষড়যন্ত্র ও দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াই এবং পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ে জুম্ম জনগণের বৃহত্তর আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে নিই।

প্রবন্ধ

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাঃ জুম্ম জাতির স্থপতি

মিতুল চাকমা বিশাল

ভূমিকাঃ

> ‘কাপ্তাই বাঁধের দরজা বন্ধ করার সাথে সাথে দেখতে দেখতে বাঁধের পানি গ্রামের পর গ্রাম গ্রাস করে নিচ্ছে। আমাদের সুন্দর প্রিয় গ্রামটিও ডুবে যাবে। সবার মধ্যে একধরনের উৎকণ্ঠা, অনিশ্চয়তা, শোক শোক ভাব। ধীরে ধীরে আমাদের বাড়ির দিকেও ধেয়ে আসছে পানি। ঠিক এমনি সময়ে মঞ্জু (এম এন লারমা) আমাদের বাড়ির দেয়াল থেকে এক খন্ড আর উঠোন থেকে আরেক খন্ড মাটি নিয়ে কাগজে ভালোভাবে মুড়িয়ে আমার হাতে তুলে দিল। আর আমাকে বলছিল, এই জিনিসগুলো সযত্নে রেখে দিতে। সেদিন সেগুলো হাতে তুলে নিতে নিতে আমি ভাবনার সাগরে ভাসছিলাম আর অবাক হচ্ছিলাম। আমার ছোট ভাই আমাকে কি কোন যাদুকরের অমূল্য সম্পদ সংরক্ষণ করে দেয়ার ভার দিচ্ছে! কাগজের প্যাকেটটি খুলে মাটির খণ্ডগুলোর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ভাবতে থাকি আর মনে মনে প্রশ্ন করি, এই মাটির খন্ডটিতে কি স্বার্থ বা কোন সাক্ষী বহন করছে কি? তখন মঞ্জুকে প্রশ্ন করেছিলাম, কেন এই মাটির টুকরো? তখন সে উত্তরে ‘এই মাটি অমূল্য জিনিস’ বলে আর কিছু না বলে কেবল একগাল হেসে চুপ করে থাকে।’
>
> *- জ্যোতিপ্রভা লারমা মিনু (মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা-জীবন ও সংগ্রাম, পৃষ্ঠা-৬৩)*

ভূমিই মানুষের জীবন, সংস্কৃতির আঁধার, বেঁচে থাকার অবলম্বন। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যে মৌলিক অধিকারের প্রয়োজন, তার সমস্ত কিছুই এই ভূমিকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। সেই ভূমির প্রতি এমনই টান অনুভব করতেন আমাদের মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। কৈশর বয়সেই যার মনে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ আর দেশপ্রেমের জোয়ার উঠেছিল, সেগুলো তাঁকে আরো উচ্চমাত্রায় বিকশিত করে তুলেছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি কেবল একজন জাতীয়তাবাদীই ছিলেন না, ছিলেন একজন আন্তর্জাতিকতাবাদীও বটে। সংসদীয় বক্তব্যগুলো দেখলে তার স্পষ্ট প্রমাণ মিলে।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময়ে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়। সর্বোপরি এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মরা। কিন্তু সেসবের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে উঠতে পারেনি। তার কারণ পশ্চাদপদ এই ঘুণেধরা সামন্তীয় সমাজব্যবস্থায় সমগ্র জুম্ম জনগণকে সংগঠিত করা সহজ কাজ ছিল না। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়। সেই সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের ‘শাসন-বহির্ভূত এলাকা’-এর মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা হলেও ১৯৬০ সালে কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়, যা পার্বত্য চট্টগ্রামের পুরো সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার পট পরিবর্তন করে দেয়। সেই সময়ে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে অধ্যায়নরত অবস্থায় মাত্র ২৪ বছর বয়সে কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে প্রচারপত্র বিলি করেছিলেন তিনি। তাও আবার সেই সময়ে, যখন ১৯৫৮ সালে স্বৈরাচারী আইয়ুব খান পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে কঠোর হস্তে শাসন চলছিল এবং ৬২-তে একটি মনগড়া সংবিধান উপহার দিয়েছিল। এর থেকেই তার প্রজ্ঞা আর দূরদর্শিতার প্রমাণ মেলে। সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষিত সমাজ, সামন্তীয় নেতৃবৃন্দের কাছে যা চিন্তারও বাইরে ছিল, সেইগুলোই তিনি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিলেন জুম্ম জনগণের কাছে এবং সর্বোপরি সমগ্র বাংলাদেশের জনগণের কাছে। এখানেই তাঁর বিশেষত্ব। জাতির ক্রান্তিলগ্নে ঘুমন্ত জুম্ম জাতিকে জাগ্রত করতে পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনিই আবির্ভূত হয়েছিলেন সূর্যের অগ্নিমশাল হিসেবে। সমগ্র নিপীড়িত-নির্যাতিত, শোষিত-বঞ্চিত জন-মানুষদের পথ প্রদর্শকরূপে।

জুম্ম জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা এম এন লারমাঃ

ছোটকাল থেকে শান্ত স্বভাবের এই মানুষটি বরাবরই সমস্ত কিছুকে প্রত্যক্ষ করতেন বিশেষভাবে। এমনকি ছোট ছোট বিষয়গুলোকেও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন তিনি। ভিন্ন ভাষাভাষি ১৪টি জাতিগোষ্ঠীকে জুম্ম জাতীয়তাবাদী চেতনায় জাগরিত করে, তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে দুর্বার গতিতে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম সংগঠিত করেছিলেন। বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে তার বাগ্মীতা, বিচক্ষণতা, প্রজ্ঞা, দেশপ্রেম, নির্ভীকতা ইত্যাদি ছিল একেবারেই অতুলনীয়। আইনজীবী হিসেবে এবং একজন শিক্ষক হিসেবেও তিনি ছিলেন সফল, তাঁর যুক্তি এবং পাঠদানের কৌশল ও ধরন ছিল অনন্য। কঠিন

বিষয়সমূহকে অতি সহজেই বুঝিয়ে বলার সামর্থ রাখতেন তিনি। ব্যক্তিজীবনে তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল, সাদামাটা জীবন-যাপন করতেন, কিন্তু চিন্তা করতেন অনেক উঁচুতে, অনেক ব্যাপকতায়। যার চিন্তার গভীরতা ছিল মহাসমুদ্রের গভীরতার চেয়েও আরো গভীর এবং মহাকাশের মতই সুবিশাল, বিস্তৃত, অসীম।

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র জুম্ম জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস নিয়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এগিয়ে গেছেন। ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জাতিগোষ্ঠীকে এক কাতারে নিয়ে আসতে তিনি জুম্ম জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন। মূলত জুম্ম জাতীয় চেতনা থেকেই জুম্ম জাতীয়তাবাদ শব্দের উৎপত্তি। যার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে জুম-নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বারা অর্থনৈতিক জীবনধারা এবং ঐতিহাসিকভাবে পশ্চাৎপদ এক সামন্তীয় শাসন-শোষণের অবসান তথা বিজাতীয় শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির জন্য একই রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা। মিজোরামের মিজোদের ক্ষেত্রে যদি দেখি, তাহলে সেখানে দেখা যায় যে, মিজোরামের প্রধান সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী লুসাই এবং লুসাই ছাড়াও এখানে পাংখো, লাই, কুকি, মারা প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। মূলত মিজো ভাষা বলতে সংখ্যাগরিষ্ঠ লুসাইদের ভাষাকেই বুঝানো হয়, তবে কালক্রমে এ ভাষার সাথে মারা, লাই প্রভৃতি ভাষারও মিশ্রণ ঘটেছে। কিন্তু জাতিগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির অধিকারী হলেও রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে তারা একই বন্ধনে আবদ্ধ আর এই বন্ধনই তাদেরকে মিজো হিসেবে একটি স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধের জন্ম দিয়েছে। তাই মিজো বললে কেবল লুসাইদেরকে বুঝানো হয় না, বরং মিজোরামে বসবাসরত লুসাইসহ পাংখো, বম, লাই, কুকি প্রভৃতি জনগোষ্ঠীকেও বুঝানো হয়ে থাকে।

মানবেন্দ্র নারয়ণ লারমা জানতেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহাসিকভাবে একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক পরিবেশ দ্বারা গঠিত অঞ্চল। এতদঞ্চলের ভিন্ন ভাষাভাষি জনগোষ্ঠী এই অঞ্চলের বৈচিত্র্যটাকে এক বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। যাদের অর্থনৈতিক জীবনধারা জুমকে কেন্দ্র করে একই ধারায় প্রবাহিত, এবং এই জুম নির্ভর অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থা থেকেই তাদের সাংস্কৃতিক এবং আত্মিক মিল লক্ষ করা যায়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, যুগ যুগ ধরে এই অঞ্চলের মানুষ শাসন-শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে আসছে। নিজেদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যতা থাকলেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুগে তাদেরকে সমষ্টিগতভাবে ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। কখনও ছিল পিপলস, কখনও ট্রাইব, কখনও পাহাড়ি ইত্যাদি। তবে পার্শ্ববর্তী চট্টগ্রামের বাঙালিরা পাহাড়িদের 'জুম্ম' বলে সম্বোধন করতো। বস্তুত, জুম অর্থ পাহাড় আর যারা পাহাড়ে বসবাস করে তাদেরকে জুম্ম বলে অভিহিত করা হয়। বস্তুত পার্শ্ববর্তী চট্টগ্রামের বাঙালিরা জংলী, অশিক্ষিত, পাহাড়বাসী ইত্যাদি হেয় অর্থে বুঝানোর জন্য পাহাড়িদেরকে 'জুম্ম' বলে সম্বোধন করতো।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষি আদিবাসী জাতিসমূহকে একক জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এম এন লারমা এই জুম্ম শব্দটির উপর ভিত্তি জুম্ম জাতীয়তাবাদের ধ্বজা তুলে ধরেছিলেন। তিনি তাঁর সুগভীর রাজনৈতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই শ্লেষার্থক 'জুম্ম' শব্দটিকে একটি বিশাল রাজনৈতিক চেতনায় উন্নীত করেছিলেন। এই জুম্ম শব্দ দ্বারা পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত ভিন্ন ভাষাভাষি প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীকেই বুঝানো হয়। নৃ-তাত্ত্বিক দিক থেকে এর বিচার ভিন্ন হতে পারে, তবে 'জুম্ম' শব্দের উৎপত্তি কেবলমাত্র নৃ-তাত্ত্বিক নয়। এর পশ্চাতে রয়েছে সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসা রাজনৈতিক দমন-পীড়নের এক অনন্য ইতিহাস। উল্লেখ্য যে, জুম্ম শব্দের অর্থ জুমচাষী নয়, এর বিশদ অর্থ হচ্ছে 'পাহাড়ের অধিবাসী'। একথাও স্বীকার্য যে, এই শব্দটি দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ভিন্ন ভাষাভাষি পাহাড়ি জাতিসমূহকে এক আত্মিক বন্ধনকেই প্রকাশ করা হয়েছে। নিজেদেরকে স্বতন্ত্র হিসেবে দাবি করার মধ্য দিয়ে, এক ঐক্যবদ্ধ জাতীয় চেতনা থেকেই জুম্ম জাতীয়তাবাদ শব্দের উৎপত্তি। জুম্ম জাতীয়তাবাদ হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ের এক চাবিকাঠির নাম।

এম এন লারমা ও উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদ:

জাতীয়তাবাদের দুটি প্রতিক্রিয়াশীল দিক থাকে। প্রথমটি, এর উগ্রতা অর্থাৎ উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং অপরটি হচ্ছে সংকীর্ণতা অর্থাৎ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ। উগ্র জাতীয়তাবাদের দ্বারা নিজ জাতি শ্রেষ্ঠ, নিজ জাতি মহান, অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী নিচ, হীন ইত্যাদি ধারণা পোষণ করা হয়। এর দ্বারাই এক জাতি অপর জাতির উপর আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ জাতিসমূহকে অধীনস্থ করে রাখার মানসিকতা তৈরি হয়, যার দরুণ শাসন-শোষণ করার এক উগ্র মানসিকতার উদ্ভব ঘটে। ঠিক যেমনটা আমরা লক্ষ করি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে হিটলারের সেই জার্মান জাতীয়তাবাদকে। যা জার্মান জাতিকে এক মরণোন্মুখ যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে এক অস্থিতিশীল পরিবেশ দান করে।

অপরদিকে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ একটি জাতিকে সবসময় ক্ষুদ্র করে দেখার মানসিকতা তৈরি করে। নিজ জাতিকে সবসময় ছোট, হীন, বঞ্চিত, শাসিত ইত্যাদি ধারণা পোষণ করা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের লক্ষণ। কিন্তু এম এন লারমার জুম্ম জাতীয়তাবাদের দ্বারা উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রকাশ পায় না,

এটি নয় কোন একক সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ। এ জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ এবং উগ্র এই দুইয়ের উর্ধ্বে এক প্রগতিশীল আন্তর্জাতিকতাবাদ। যা পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসরত জুম্ম জনগোষ্ঠীদের এক আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ করেছে, তাদেরকে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত রাখার মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে এবং এখনও করে যাচ্ছে। জুম্ম জাতীয়তাবাদ কেবলমাত্র উগ্র জাতীয়তাবাদের কাউন্টার ন্যারেটিভও নয়, এটি ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জাতির আত্মিক বন্ধন, সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক শৃঙ্খলা এটি।

এম এন লারমা জুম্ম জাতীয়তাবাদী হলেও তার চিন্তার ব্যাপ্তি কেবলমাত্র জুম্ম জনগণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তিনি সমস্ত নিপীড়িত-নির্যাতিত জাতি মানুষদের কথা বলতেন, মেহনতি কৃষক, শ্রমিক, মেথরদের কথা বলতেন। বস্তুত তিনি জুম্ম জাতীয়তাবাদী হলেও বাস্তবিক পক্ষে তিনি একজন আন্তর্জাতিকতাবাদী। ২৫ অক্টোবর ১৯৭২ সালে সংবিধান বিলের উপর সাধারণ আলোচনায় তার বক্তৃতা থেকেই স্পষ্ট প্রমাণ মেলে। তিনি বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা পুরোপুরি এই সংবিধানে নাই। যদি সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা এই সংবিধানে থাকত, তাহলে আমার আপত্তির কোন কারণ থাকত না। কিন্তু আজ আমি দেখতে পাচ্ছি পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, মাতাভাঙ্গা, শঙ্খ, মাতামুহুরী, কর্ণফুলী, যমুনা, কুশিয়ারা প্রভৃতি নদীতে রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে যারা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরে নিজেদের জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করে নৌকা বেয়ে দাঁড় টেনে চলেছেন, রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা শক্ত মাটি চষে সোনার ফসল ফলিয়ে চলেছেন, তাদের মনের কথা এই সংবিধানে লেখা হয়নি। আমি বলছি, আজকে যারা রাস্তায় রাস্তায় রিক্সা চালিয়ে জীবন নির্বাহ করে চলেছেন, তাদের মনের কথা এই সংবিধানে লেখা হয়নি।'

এর থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তিনি কেবল নিজ জাতির মধ্যে, নিজের জাতীয়তাবোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি। পৌঁছে গিয়েছিলেন মেহনতি মানুষদের পরম বন্ধুরূপে, সমস্ত নিপীড়িতদের মুক্তির কাণ্ডারীরূপে।

অন্যদিকে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের বাঙালি জাতীয়তাবাদ উগ্র জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়ে বাংলাদেশে বসবাসরত বাঙালি ভিন্ন অন্যান্য জাতিসমূহের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তাদেরকে বাঙালি হয়ে যাওয়ার প্রস্তাব রাখে। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ (৯)-এ জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, 'ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালি জাতির জাতির ঐক্য ও সংহতির প্রতীক হইবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।'

এখানে প্রকাশ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধে কেবলমাত্র 'একক সত্তাবিশিষ্ট' বাঙালি জাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাঙালি ভিন্ন অপরাপর আদিবাসী জনসমাজকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সংবিধানের অনুচ্ছেদ (৬)-এ সংশোধনী প্রস্তাব এনে আবদুর রাজ্জাক ভূঁইয়া প্রস্তাব পেশ করেন যে, 'বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে, বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন।' মর্মে সন্নিবেশিত করা হোক। সেদিন সঙ্গে সঙ্গে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, 'আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বসবাস করে আসছে। বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় বাঙালিদের সঙ্গে আমরা লেখাপড়া করে আসছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সব দিক দিয়েই আমরা একসঙ্গে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দপুরুষ কেউ বলে নাই, আমি বাঙালি।'

কিন্তু সংশোধনী প্রস্তাব পাস হয়ে যায়। উগ্র জাত্যাভিমানের কাছে এম এন লারমার বক্তব্য সেদিন গৃহীত হয়নি। যার প্রতিবাদ স্বরূপ এম এন লারমা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য গণপরিষদ বৈঠক বর্জন করে, পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করে চলে যান।

এম এন লারমা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম:

'আমরা করুণার পাত্র হিসেবে আসিনি। আমরা এসেছি মানুষ হিসেবে। তাই মানুষ হিসেবে বাঁচার অধিকার আমাদের আছে।' *-এম এন লারমা (বাংলাদেশ গণপরিষদ বিতর্ক, ২৫ অক্টোবর ১৯৭২)*

পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসরত পাহাড়ি জনগণ যুগ যুগ ধরে প্রকৃতির সাথে লড়াই করে প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে শত প্রতিকূলতাকে ডিঙিয়ে প্রকৃতিকে বাসযোগ্য করে তুলেছে। এ হচ্ছে প্রকৃতির প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে এক সংগ্রাম। প্রকৃতির সাথে সাথে এতদঞ্চলের বিভিন্ন প্রাণীকূলের সাথেও সংগ্রাম

করতে হয়েছে তাদের। এই লড়াইয়ে পুরোপুরি বিজয় অর্জিত না হলেও বলা চলে মোটামুটি জীবন ধারণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা তারা অর্জন করতে পেরেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সুবিশাল ধন-সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ আর ব্যবহারের বিষয়টিও তারা করেছে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে। সমগ্র বিশ্বে কোন না কোন সময়ে দূর্ভিক্ষ, খাদ্যভাব দেখা দিলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে সে ধরনের কোন উপদ্রবের দেখা মেলেনি। কিন্তু উপনিবেশিক শক্তির হিংস্র থাবা থেকে এই পাহাড়ের রক্ষা হয়নি। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এই অঞ্চলকে চুষে খাওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হতে থাকে। মোঘল, ব্রিটিশ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ কোনকালেই তার ভাটা পড়েনি।

অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের সাথে যুক্ত করে এই লুটপাটের প্রতিযোগিতাকে আরো উলঙ্গ করে দেয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের পশ্চাদভূমি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ব্যবহার হেতু এই অঞ্চলকে পাকিস্তানের সাথে যুক্ত করার এক উদ্ভট কারণও হাজির করা হয়েছে। ধর্মীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে যে বিভাজন হচ্ছিল, পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় এসে সেটা ধর্মের বাইরে গিয়ে কেবল লুণ্ঠনের সহজলভ্যতায় পরিণত হয়েছিল। পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রতি মাসে ৬০-৭০ লাখ ঘনফুট গাছের পারমিট দেওয়া হতো। সেই হিসাবে বৎসরে প্রায় ৭ কোটি ২০ লাখ ঘনফুট গাছ পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বাইরে পাচার করা হতো। বর্তমানে গাছ কমে যাওয়ায় প্রতি মাসে ৫ লাখ ঘনফুট গাছের পারমিট প্রদান করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে বন বিভাগের ৪টি ডিভিসন থেকে এই হিসাবে বৎসরে প্রায় ২ লাখ ৬০ হাজার ঘনফুট গাছ পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বাইরে পাচার করা হয় (সূত্রঃ হিল ভয়েস)। এ তো কেবল গাছের হিসাব। এছাড়াও বাঁশ, বেত, পাথর প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদকে লুণ্ঠন করে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবেশ এবং এর অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়ে একে দাসত্বের শৃঙ্খল পরানোর প্রচেষ্টা চলছে। ষাটের দশকের কাপ্তাই বাঁধ তাই জুম্ম জনগণের মরণ ফাঁদ হয়েই রয়ে গেছে।

প্রকৃতির সাথে লড়াইয়ে যে মানুষ নিজেকে সগৌরবে দাঁড়িয়ে রেখেছে, সেই মানুষগুলোকে কৃত্রিম উন্নয়নের জোয়ারে ভাসিয়ে অসহায়ে পরিণত করা হয়েছে। সরল উৎপাদন ব্যবস্থার সরলতাকে কাজে লাগিয়ে নীরবে-নিভৃতে নির্যাতন-নিপীড়নের যাঁতাকলে পিষ্ট করে কৃত্রিম এক সরলতার তকমা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তাই জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন এক মুক্তির কাণ্ডারী হয়ে। সদ্য স্বাধনীতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের সংবিধানে পাহাড়ের মানুষদের জন্য একটু ঠাঁই খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে আসা ভিন্ন ভাষাভাষী ১৪টি জাতিগোষ্ঠী যুগ যুগ ধরে শোষণ ও নিপীড়নের শিকার হয়ে আসছে, এই সত্যকে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এই ১৪টি জাতিগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করতে জুম্ম জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ধারণ করে ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি এম এন লারমার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করে। তৎপরবর্তী ০২ নভেম্বর ১৯৭২’ সংবিধান বিল বিবেচনা (দফাওয়ারী পাঠ)-এ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সংবিধানে ‘৪৭(ক)। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল বিধায় উক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারের নিরাপত্তার জন্য উক্ত অঞ্চলটি একটি উপজাতীয় স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হইবে’ নামে একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করার প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু তাঁর সেই প্রস্তাবটিকে ‘বিধি বহির্ভূত’ বলে নাকচ করে দেওয়া হয়।

শুরুতেই বলেছিলাম, ‘ভূমিই মানুষের জীবন’। এই ভূমিকে ঘিরেই মানুষের সামাজিকতা, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, রাজনীতি সমস্ত কিছু আবর্তিত হয়। সেই ভূমিকে নিরাপদ রাখার প্রয়াস তাই এম এন লারমাও করেছিলেন। ভূমিকে নিরাপদ রাখার অর্থ হলো এই যে, ভূমির সাথে সাথে এর সাথে জড়িয়ে থাকা সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতিকে নিরপাদ রাখা। ব্রিটিশের কাছে থেকে স্বাধীনতা নিয়ে পাকিস্তান সরকার তথাকথিত বিজলী বাতি আর উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে এতদঞ্চলের লক্ষাধিক পাহাড়িকে বাস্তুচ্যুত করতে যখন মরিয়া, সেই সময়ে নিজের মাতৃভূমির রক্ষার্থে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন প্রচারপত্র বিলি করে। নিজ ভূমির মানুষ ভূমি হারিয়ে, সহায়-সম্বল হারিয়ে, নিঃস্ব হয়ে পরদেশে পাড়ি জমাচ্ছে, কেউ বা নিজ দেশে পরবাসী হয়ে পড়ছে, শাসকের লোলুপ দৃষ্টি যখন পুরো পার্বত্য চর্টগ্রামে, তখনই তিনি উঠে দাঁড়ানোর সাহস করেছিলেন। নিজের বাস্তুভিটার এক খণ্ড মাটি নিয়ে দৃঢ় শপথ নিয়েছিলেন, সেই মাটির মর্যাদা রাখার। ফলশ্রুতিতে ১৯৭২ সালে গঠন করেছিলেন জনসংহতি সমিতি। যার লক্ষ্য হচ্ছে একটি শোষণহীন ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা। যার আদর্শ স্বয়ং মানবতাবাদ।

সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশে পার্বত্যবাসীর রাজনৈতিক অধিকারকে ভূলুণ্ঠিত করে, তাদের প্রতিনিধিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে। যুগ যুগ ধরে ঐতিহাসিকভাবে বিশেষ শাসন ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত পার্বত্য চট্টগ্রামের মর্যাদাকে বাতিল করে দিয়ে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশের পথটিকে উন্মুক্ত করা হয়েছে। এতদঞ্চলের প্রথাগত ও ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকারকে খর্ব করে কেবলমাত্র করুণার পাত্র হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। স্বভাবতই জাতির ক্রান্তিলগ্নে সেই সময়ে প্রগতিশীল এক আদর্শকে ধারণ করে এম এন লারমার আবির্ভাব হয়েছিল।

গণপরিষদে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম হল বিভিন্ন জাতিসত্তার ইতিহাস। কেমন করে সেই ইতিহাস সংবিধানের পাতায় স্থান পেল না, তা আমি ভাবতে পারি না। সংবিধান হচ্ছে এমন একটা ব্যবস্থা, যা অনগ্রসর জাতিকে, পিছিয়ে পড়া, নির্যাতিত জাতিকে, অগ্রসর জাতির সাথে সমান তালে এগিয়ে নিয়ে আসার পথ নির্দেশ করে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে এই পেশকৃত সংবিধানে আমরা সেই রাস্তার সন্ধান পাচ্ছি না।'

কিন্তু রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকদের কাছে তাঁর সেই বক্তব্য সেদিন গৃহীত হয়নি। রাষ্ট্র সেদিন এক বঞ্চিত মানবের অধিকারকে স্বীকার করতে পারেনি। উগ্র জাত্যাভিমানের কাছে স্বাধীন দেশের একজন নাগরিকের অধিকারই কেবল নয়, সমগ্র দেশের একটি অংশের অধিকারকে সেদিন হরণ করা হয়েছিল। তাই তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্ত সচেতন ব্যক্তিদের নিয়ে পার্বত্যবাসীকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার মহান ব্রত নিয়ে এগিয়েছেন পাহাড় থেকে পাহাড়ে। শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়ে জুম্মদের চেতনাবোধকে জাগ্রত করার মহাপ্রয়াস করেছিলেন, যাদের অধিকাংশই ছিলেন শিক্ষক।

এম এন লারমা ও প্রতিবিপ্লবী চক্ররা:

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছিলেন পাহাড়ের সেরা চিন্তাবিদ। তাঁর চিন্তা ছিল অনেক উঁচুতে অনেক ব্যাপকতায়। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, পাহাড়ের মানুষদের বিজাতীয় শাসন-শোষণের যাঁতাকল থেকে মুক্তি দিতে হবে এবং একটি শোষণহীন ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাষ্ট্রযন্ত্র এবং বর্তমান সমাজের মূল চালিকাশক্তি ও এর শাসনযন্ত্রকে সমূলে উৎখাত করতে তাই প্রয়োজন এক বিপ্লবের। তিনি সেই পথেই হেঁটেছিলেন। বিপ্লবের জন্য প্রধানতম শর্ত হচ্ছে একটি বিপ্লবী পার্টি গঠন করা।

সেই হেতু ১৯৭২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের ভাগ্যকাশের কালো মেঘের ঘনঘটাকে সরিয়ে দিতে আবির্ভূত হয় পাহাড়ের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট পাহাড়ি জনগণের চার দফা দাবিনামার ভিত্তিতে রচিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ঐতিহাসিকের প্রেক্ষিতে পার্টির যাত্রা শুরু হয়।

বিপ্লবী পার্টির পরে সমাজবিপ্লবের জন্য প্রয়োজন বিপ্লবী পরিস্থিতি, বিপ্লবী জনগণ এবং বিপ্লবী কর্মীবাহিনী। পার্টি প্রতিষ্ঠার পরে তিনি উপরোক্ত শর্তাবলীর সবগুলোরই পরিপূরণ করেছিলেন এবং এক সুমহান বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। যার প্রথম পদক্ষেপ ছিল বিজাতীয় শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে জন্ম নেওয়া 'জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম'। যার লক্ষ্য অংশ হচ্ছে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন।

পার্টির প্রতিষ্ঠাকালীন সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে জনগণকে আন্দোলনমুখী, সচেতন এবং বিপ্লবী করতে প্রাথমিকভাবে গণসংযোগের কাজ শুরু করেন তিনি। ঐতিহাসিকভাবে ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও একই অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ, যুগ যুগ ধরে বহিরাগতদের কর্তৃক শোষিত ও নিপীড়িত পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীদের জুম্ম জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করে লাল-সাদা অবয়বে স্বর্ণ তারকা খচিত একই পতাকার তলে নিয়ে আসেন। শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে গ্রামে চলো নীতির ভিত্তিতে শেখড়ের সন্ধানে পাহাড়ের মানুষকে উজ্জীবিত করা হয় তারই নেতৃত্বে।

তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে পার্টির নীতি-কৌশল প্রণয়নে তার দূরদর্শিতা। পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য, অতীত ইতিহাস এবং বর্তমান সময়ের গভীর উপলব্ধি করতে না পারলে এই ধরনের দূরদর্শী নীতি-কৌশল প্রণয়ন করা একেবারেই অসম্ভব। নীতি এবং কৌশলই হচ্ছে পার্টির প্রাণ। আর এই সুনির্দিষ্ট নীতি-কৌশল প্রণয়নে এম এন লারমার দূরদর্শিতা অতুলনীয়। বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর সাথে অসম এক লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে তিনি ঠিক করেছিলেন নীতিগতভাবে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম এবং কৌশলগতভাবে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই।

মহান পার্টি এই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়েই সামনে অগ্রসরমান ছিল। কিন্তু পার্টির কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে সামন্তীয় ও পেটি বুর্জোয়া শ্রেণির চরিত্রগুলো ক্রমেই প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে। তাদের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা, লালসা ও ভোগবাদী তথা সুবিধাবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে শুরু করে। একটা বিশেষ পর্যায়ে গিয়ে তারা পার্টির নেতৃত্বের প্রতি অবিশ্বাস ও আন্দোলন নিয়ে চরম হতাশায় ভুগতে শুরু করে। অপরদিকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে, নিজেদের আত্ম-অহমিকাকে জিঁইয়ে রাখতে আন্দোলন নিয়ে জনমনে এবং পার্টির কর্মীর মধ্যে ভুল বার্তা দেওয়া শুরু করে। ক্ষমতার লিপ্সায় অন্ধ হয়ে সেই পথভ্রষ্ট, আদর্শচ্যুত গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ পার্টির মধ্যে উপদলীয় চক্রান্ত শুরু করে এবং পার্টির কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটির সমান্তরাল একটি কমিটি তৈরি করে জুম্ম জনগণের আন্দোলনকে বিভাজনের পথে নিয়ে যায়। পার্টির দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের ঐতিহাসিক মূলনীতিকে পদদলিত করে দ্রুত নিষ্পত্তির দাবি তুলে ধরতে শুরু করে। বস্তুতপক্ষে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিচারে সেই সময়ে তাদের সেই দ্রুত নিষ্পত্তির দাবিটি ছিল সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক এবং মূর্খতাসুলভ।

কিন্তু জাতির সেই কুলাঙ্গারেরা উপদলীয় চক্রান্ত করেই ক্ষান্ত থাকেনি। পার্টির পক্ষ থেকে মহান নেতার সেই ‘ক্ষমা করা, ভুলে যাওয়া’ নীতির ভিত্তিতে বরাবরই আলোচনার টেবিলটিকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই কুচক্রীরা বরাবরই কোন না কোন বাহানা দেখিয়ে আলোচনার টেবিলটিকে পাশ কাটিয়ে কিংবা কোন প্রকার আগ্রহ না দেখিয়েই নিজেদের অপকর্মকে চলমান রাখে। পার্টির অস্ত্রাগার দখল করে গোপনে সেখান থেকে অস্ত্রগুলো সরাতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তারা জুম্ম জাতির মহান স্থপতি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে হত্যা করতেও পিছপা হয়নি। ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কজনক এক অধ্যায় রচিত হয় ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর দিনে। জুম্ম জনগণের ভাগ্যকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা কাটতে না কাটতেই সুনামির ঢেউ এসে যেন সমস্ত কিছু তোলপাড় করে দিয়ে গেল। তারা কেবল একটি জীবন্ত মানুষকেই হত্যা করেনি সেদিন, হত্যা করার চেষ্টা করেছে ভিন্ন ভাষাভাষি পাহাড়ি মানুষের সুমহান আন্দোলনকে। কিন্তু ইতিহাস তাদের ক্ষমা করেনি। তাদেরকে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত করেছে এই জুম্ম জাতি।

প্রাসঙ্গিকতা:

সময়ের আবর্তে অনেক কিছুই লুপ্ত হয়ে যায়, অনেক কিছুই ধ্বংস হয়ে যায়। তবে এম এন লারমার প্রাসঙ্গিকতা কোন কালেই হারাবে না, কোন সময়েই লুপ্ত হবে না। বিশ্বের সমস্ত নিপীড়িতের আন্দোলনে এবং আন্দোলনের পরেও তার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বর্তমান সময়ে এম এন লারমা আরো বেশি প্রাসঙ্গিক। কেননা সাম্রাজ্যবাদ বিগত সময়ের চেয়েও আরো ভয়ংকর আর কৌশলে পদক্ষেপ ফেলে শোষণের স্ট্রীম রোলার চালিয়ে যাচ্ছে। জাতীয়তাবাদের উত্থান, ধর্মীয় মৌলবাদের উত্থান, পুঁজির লগ্নিকরণ এ সমস্ত কিছু বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিকে আরো জটিল থেকে জটিলতর করে তুলছে। এ সময় স্বাধিকারের জন্য লড়াই করা প্রত্যেক জাতি ও শ্রেণির কাছে বর্তমান পরিস্থিতি আরো বেশি কঠিনরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ কলোনীর নেশায় মত্ত হয়ে সংঘাতকে আপন করে নিয়ে সমগ্র বিশ্ববাসীকে ধীরে ধীরে এক মরণোন্মুখ যুদ্ধের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিও আজ এক ভিন্ন মাত্রায় ধাবিত হচ্ছে। দীর্ঘ দুই দশকের অধিক সশস্ত্র সংগ্রামের ফসল পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি আজ মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। নয়া উপনিবেশিক কায়দায় শোষণের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেয়ে, স্লো পয়জনিং-এর দ্বারা মিলিটারাইজেশন এবং এতদঞ্চলের জনমিতিতে ব্যাপক পরিবর্তন করানো হচ্ছে।

রাষ্ট্র উগ্র জাতীয়তাবাদের খোলসের বাইরে আরো একটি খোলসের দ্বারা আবৃত হয়েছে এখন, সেটি হচ্ছে ধর্মীয় মৌলবাদের খোলস। যেখান থেকে রাষ্ট্র কিছুতেই বেরুতে পারছে না। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকার কর্তৃক ‘রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে ইসলামকে’ স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, আবার ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য ‘কোন ধর্মকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দান’ এই বাক্যটিও সংযোজিত রয়েছে। এর থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ধর্মীয় মৌলবাদকে বাইরের ধর্মনিরপেক্ষতার স্বচ্ছ আবরণ দ্বারা আবৃত করার চেষ্টা করছে রাষ্ট্র। সংবিধানের শুরুতে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম’ সংযোজিত রয়েছে। সামরিক জান্তারা সেগুলো খুব ভালোভাবেই পাকাপোক্ত করে রেখে গেছে, আর তথাকথিত গণতন্ত্রের মানসকন্যা, মানসপুত্ররা সেই সামরিক জান্তাদের নীতি বহির্ভূত কোন কিছু করতে কোন সাহসই করতে পারে না। এম এন লারমার সেই সাত কোটি মানুষের মনের কথার সংবিধানরূপে এটি কখনই মুখ তুলতে পারেনি। শাসকগোষ্ঠীর শাসন-শোষণের হাতিয়ার হয়েই রয়ে গেছে এটি।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার যে স্বপ্ন, একটি সুন্দর, নিরাপদ পার্বত্য অঞ্চলের, সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার সময় এসে গেছে। তারুণ বয়সে যে প্রকারে এম এন লারমা লড়াইয়ের ময়দানে পা রেখে গেছেন, ঘুমন্ত জুম্ম জাতিকে জাগ্রত করে তাদের ঐক্য ও সংহতিকে প্রসারিত করেছেন, সেই ঐক্য ও সংহতির মূলে এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী মহল আঘাত করেছে। আংশিক সুবিধা লাভের প্রত্যাশায় সামগ্রিক স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়া সুবিধাবাদীরা আবারও শোষকের পা চাটা কুকুরে পরিণত হয়েছে। জুম্ম জনগণের চলমান আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে মৃত এম এন লারমার নাম ভাঙিয়ে সংস্কারপন্থী নামে পার্টিকে বিভক্ত করেছে।

এই সময়ে এমনিতর কঠিন বাস্তবতায় এম এন লারমার আদর্শকে ধারণ করে, লড়াইয়ের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়াই তারুণ্যের কর্তব্য। প্রতিটি তারুণ্যের মনে এম এন লারমার যে রক্ত প্রবাহিত, সেই রক্ত কণিকাকে উত্তপ্ত করার সময় এসে গেছে। আমাদের ধমনীর শিরায় শিরায় বেঁচে থাক এম এন লারমা, এমন প্রতিজ্ঞায় সংকল্পবদ্ধ হতেই হবে। রাষ্ট্রের জুম্ম স্বার্থ বিরোধী পলিসিকে বানচাল করতে হলে, একটি সুন্দর জীবনের প্রত্যাশা করতে হলে, আগামীর জন্য নিরাপদ আবাসস্থল পেতে হলে এম এন লারমার পথেই হাঁটতে হবে। তাঁর সমস্ত কার্যকলাপকে স্বার্থক তখনই মনে হবে, যখন প্রতিটি তরুণ-তরুণী তাঁর অনুসারী কেবল নয়, তাঁর চেতনাকে ধারণ করে এক নতুন সমাজ বিনির্মাণে অগ্রগামী হয়ে পথ দেখাবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি: রক্তাক্ত শান্তির শ্বেত কপোত

বিজয় বিকাশ ত্রিপুরা

পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জাতির অস্তিত্ব আজ চরমভাবে বিপদাপন্ন। জুম্ম জাতির অস্তিত্বের শেকড়ে টান পড়েছে। জুম পাহাড়ে সবাই এক অনিশ্চিত ও নিরাপত্তাহীন জীবন অতিবাহিত করছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়িত না হওয়ায় জুম্ম জনমনে হতাশা, ক্ষোভ বিরাজ করছে। ২৪ বছরে শুধুই দীর্ঘশ্বাস! আর জ্যামিতিক হারে বাড়ছে সন্দেহ-অবিশ্বাস।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র সুসংহত ও আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘস্থায়ী শান্তির প্রত্যাশা দূর অস্ত। শান্তির সাথে মানবাধিকারের বিষয়টিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আইন-শৃঙ্খলা, আইনের সুশাসন, সৌভ্রাতৃত্ব, সমঝোতা, বন্ধুত্ব, সুনাম, আন্তরিকতা, অনাগ্রাসন, অহিংস অবস্থান এসবই শান্তির প্রতিশব্দ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ অত্যন্ত সহজ-সরল ও শান্তি প্রিয়। তারা অশান্তি চায় না, শান্তি চায়। মনে প্রাণেই শান্তি চায়। সেই শান্তির প্রত্যাশাকে নস্যাৎ করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর পরই নানা ষড়যন্ত্র শুরু হয়। একটি বিশেষ কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহল চায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা জিঁইয়ে থাকুক। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অশান্ত থাকলে ওই কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহলের লাভ! কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি আবার অশান্ত হয়ে উঠুক এটা দেশের কোন প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও শান্তিকামী মানুষের কামনা হতে পারে না।

শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছিল এবং আশি দশকে স্বৈরাচারী সামরিক শাসকরা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে সমস্যা সমাধানের ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। সামরিক শাসকরা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে সামরিক উপায়ে সমাধানের জন্য আশি দশকে সামরিক শাসন ‘অপারেশন দাবালন’ জারি করে অধিকারকামী জুম্ম জনগণের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন, দমনমূলক সমস্ত স্ট্রীম রোলার চালিয়েছিল। পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানার্থে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যা দেশে-বিদেশে ‘শান্তি চুক্তি’ নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার অর্জন করেন। অবাক করা বিষয় হলো- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের দুই যুগ হতে চললো কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরকারী ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার অতীতের সামরিক শাসকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে একইভাবে ভুল পথে হাঁটছে!

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরও ২০০১ সালে অপারেশন দাবাননের স্থলে ‘অপারেশন উত্তরণ’ নামক সামরিক শাসন জারি করা হয়। প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের বহু ঘটনা ঘটছে। কথা ছিল- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক অপারেশন উত্তরণসহ সকল অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হবে। কিন্তু আজ আমরা কি দেখছি? আমরা দেখছি ঠিক উল্টো! প্রত্যাহারকৃত ক্যাম্পের জায়গা-জমিতে নিরাপত্তাবাহিনী কর্তৃক পাহাড়ে পাহাড়ে আজ সতর্কীকরণ সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে নতুন করে জনসাধারণের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে! নতুন করে নিরাপত্তাবাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। অপরদিকে, সেনা অভিযানের নামে গভীর রাতে বাড়ি ঘেরাও-তল্লাসী, গ্রেফতার, ক্যাম্পে আটকে রেখে লোমহর্ষক নির্যাতনের বিষয়টি এখন নৈত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ‘অপারেশন উত্তরণ’ নামক জারিকৃত সেনা শাসন জোরদার করা হয়েছে। অথচ ২০১৮ সালের ২৮ অক্টোবর পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন– ‘পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাটি রাজনৈতিক সমস্যা। রাজনৈতিক সমস্যাটিকে রাজনৈতিকভাবে মীমাংসা করতে হবে। মিলিটারি দিয়ে এর সমাধান হবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামে আর কোন সংঘাত নয়, যেন শান্তি বজায় থাকে। এই শান্তির পথ ধরে আসবে প্রগতি।’ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলতে হয় আপনার উল্লেখিত বক্তব্যের দৃশ্যমান কোন কার্যকর উদ্যোগ দেখতে না পাওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান উদ্ভুত পরিস্থিতিতে আপনার এ বক্তব্য নিছক কথার কথা মনে হয়!

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার মুনাফালোভী, পরিবেশ ধ্বংসকারী তথাকথিত উন্নয়ন, বাণিজ্যিক পর্যটন এখানকার প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংসসহ জুম্ম জনগণের জীবন-জীবিকার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহিরাগত সেটেলার মুসলিম ভূমি দস্যুদের দৌরাত্ম্যে জুম্ম জনগণ প্রতিনিয়ত নির্যাতন, নিপীড়ন, হত্যা, হামলাসহ নারী-শিশু ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। শুধু ভূমি আগ্রাসন নয়, সর্বত্র গ্রাম-এলাকা-স্থানের নাম পর্যন্ত পরিবর্তন করা হচ্ছে। ইসলামী সম্প্রসারণবাদ কায়েমের অপতৎপরতা জোরদার করা হয়েছে। অপরদিকে সরকারের জোর জবরদস্তিমূলক টুঁটি চেপে ধরে

গেলানো তথাকথিত উন্নয়ন জুম্ম জনগণের জীবন-জীবিকার হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। জুম্ম জনগণ যখন এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তখন তাদের সেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে অপপ্রচার চালানো হয় যে, ওরা রাষ্ট্র বিরোধী, সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি ইত্যাদি। তাই সঙ্গত: কারণে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন কোথায় গিয়ে ঠেকেছে। জুম্ম জনগণ প্রতিমুহূর্ত চরম নিরাপত্তাহীন ও অস্তিত্ব সংকটে জীবন অতিবাহিত করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপনিবেশিক কায়দায় শাসনের মানসিকতা যেমন পরিবর্তন হওয়া দরকার তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতাগুলো কি কি সেটা চিহ্নিত করাটাও এখন অত্যন্ত জরুরী। সরকারকে এটা মনে রাখা দরকার যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে যতই কালক্ষেপণ করা হবে ততই স্থায়ী শান্তি ও সুষম উন্নয়নের অগ্রযাত্রাও ব্যাহত হবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের সকল দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, যা দেশের সামগ্রিক স্বার্থে কখনোই মঙ্গল বয়ে আনবে না।

দেশে আমলাতন্ত্রের দুর্দান্ত দাপট বেড়েই চলছে। আওয়ামী লীগ টানা এক যুগের অধিক সময় ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়। ফলে আজ রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ ও সরকার একাকার হয়ে গেছে। শাসন ব্যবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রাম তার অনন্য দৃষ্টান্ত। পার্বত্য চট্টগ্রামের নানা ইস্যুতে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতৃত্বের ভূমিকাও নি:সন্দেহে প্রশ্নবিদ্ধ। আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে চলছে কোটিপতি হওয়ার প্রতিযোগিতা! স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সীমাহীন দুর্নীতি, দলীয়করণ, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ঘুষ, অবৈধ ব্যবসা, চাকরি বাণিজ্যসহ নানা অনিয়মের বিরুদ্ধে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ প্রতিবাদ করার কারণে তারা জনসংহতি সমিতিকে প্রতিপক্ষ মনে করে! তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে ভুলভাল বুঝিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের ষড়যন্ত্র দীর্ঘ দিনের। তারই ধারাবাহিকতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সমর্থক ও জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দকে মিথ্যা মামলা, গ্রেফতার ও হয়রানির মাধ্যমে এলাকা ছাড়া ও কোণঠাসা করার অভিযোগ রয়েছে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বহু নেতা-কর্মী-সমর্থক আজ স্থানীয় আওয়ামী লীগের ষড়যন্ত্রে মিথ্যা মামলায় ফেরারী জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। আওয়ামী লীগের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতকেও জনসংহতি সমিতির উপর দায় চাপানোর ঘটনা দেখা যায়। ইতিমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে কথিত সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি দমনের নামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের নানা ঘটনা প্রবাহ জুম্ম জনগণকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের স্থানীয় শীর্ষ নেতারা জুম্ম হলেও তারা জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করছে ও বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার চালাচ্ছে যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী কার্যকলাপ হিসেবে নি:সন্দেহে বলা যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে কারা অশান্তি সৃষ্টি করছে? পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করলে কেন তাকে সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, অস্ত্রধারী দুর্বৃত্ত হিসেবে আখ্যায়িত করে মিথ্যা মামলা, গ্রেফতার, হয়রানি করা হবে? পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে এমন ভয়াবহ অবস্থার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এখন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি করাও যেন অপরাধ! হেলিকপ্টারে করে চট্টগ্রাম ও ঢাকা থেকে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের কিছু ভাড়াটিয়া সাংবাদিক এনে জনসংহতি সমিতির অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী হিসেবে সাক্ষাৎকার নেওয়ার নাটকও মঞ্চস্থ করা হচ্ছে! জনগণকে বোকা মনে করে এসব অপপ্রচারের নাটক মঞ্চস্থ করতে গিয়ে নিজেরাই জনগণের কাছে হাসির খোরাক হয়েছে। নাটকের পরিচালকরা পার্বত্য চট্টগ্রামে নিজেদের অবস্থান ও প্রয়োজনীয়তাকে জাহির করতে গিয়ে সন্ত্রাসী এলাকা হিসেবে অপপ্রচার চালাচ্ছে! এতে করে দেশে-বিদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টিসহ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ও প্রশাসনের ব্যর্থতায় সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নানা তালবাহানায় দুই যুগের অধিক সময় ধরে কার্যত অচলাবস্থায় রয়েছে। সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ব পরিস্থিতির মতো সামরিকায়নে নিরাপত্তাবাহিনীর মহড়া দেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের আর কোন আন্তরিক ও সদিচ্ছা আছে বলে মনে হচ্ছে না। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতা-কর্মীদের নামে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা, গ্রেফতার ও হয়রানির মাধ্যমে এলাকা ছাড়া ও কোণঠাসা করে দেয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে দাবি-দাওয়া নিয়ে কোন কর্মসূচি পালন করার মতো গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই বলে অনেকেই অভিযোগ করেছেন। বিগত সময়ে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালনে বাধা প্রদানসহ বিভিন্ন কাজে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ ও হয়রানির অভিযোগ রয়েছে। এসকল ঘটনা প্রবাহ জুম্ম জনগণের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করছে।

ক্ষমতালিপ্সু, চরম সুবিধাবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল, দালালরা বিশেষ বাহিনীর মদদে গাঁটছড়া বেঁধে জুম্ম স্বার্থবিরোধী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জুম্ম জাতীয় অস্তিত্বকে আজ এক কঠিন সঙ্কটের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আরাকান লিবারেশন পাটি (এএলপি) থেকে দলচ্যুত একটি গ্রুপ মারমা লিবারেশন পার্টি

(এমএলপি) বা মগ পার্টি নামে বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় আজ ত্রাসের রাজস্ব কায়েম করে চলেছে। মগ পার্টি নামক সন্ত্রাসী গ্রুপটির অবস্থান এক সময় বান্দরবান জেলার রুমা, থানচি, লামা, আলীকদম, রোয়াংছড়ি ছিল। স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের মদদে ২০১৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মগ পার্টিকে রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলায় নিয়ে আসা হয়েছিল বলে জানা যায়। মগ পার্টির সন্ত্রাসীরা আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদানে জনগণকে বাধ্য করেছিল। এখন মগ পার্টি'র সন্ত্রাসীরা রাজস্থলী ও কাপ্তাই উপজেলায় চাঁদাবাজি, অপহরণসহ নানা অপরাধের সাথে জড়িত রয়েছে। মগ পার্টি সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষক ও মদদদাতা হিসেবে জেলা ও উপজেলার শীর্ষ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের নামও শুনা যায়। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে মগ পার্টি, সংস্কারপন্থী জেএসএস, ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) নেতাদের বেশ দহরম-মহরম! মগ পার্টিসহ নানা সন্ত্রাসী গ্রুপের মাধ্যমে অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়, হত্যা, গুম, চাঁদাবাজির এক অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হচ্ছে। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দালের জের ধরে মগ পার্টির সন্ত্রাসীদের ভাড়া করে একপক্ষ-অন্যপক্ষকে হত্যা করে জনসংহতি সমিতি নেতা, কর্মী, সমর্থকদের ওপর এ ঘটনার দায় চাপানো হচ্ছে। জনসংহতি সমিতি নেতা, কর্মী, সমর্থকদের বিরুদ্ধে অসংখ্য মিথ্যা মামলা দিয়ে এলাকা ছাড়া করা হয়েছে। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের দায়েরকৃত ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা চালাতে গিয়ে অনেক পরিবার নিঃস্ব হয়ে গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। পরিস্থিতি এখন ছাঁই চাপা আগুনের মতো রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের দীর্ঘ দুই যুগ হতে চললো এই চুক্তি এখন রক্তাক্ত শান্তির শ্বেত কপোত! সামরিক শাসনের যাঁতাকল থেকে মুক্তি ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কার্যকর করে জুম্ম জাতির অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র পথ হলো- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন। তাই মহান বিপ্লবী নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লালমার সংগ্রামী চেতনা এবং আত্মত্যাগের মহান আদর্শে বলিয়ান হয়ে জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজকে ঐতিহাসিক দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে ইস্পাত কঠিন ঐক্য ও সংগ্রামী চেতনা নিয়ে পার্বত্য চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে। বলা বাহুল্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে জুম্ম জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গতিপথ শেষাবধি শাসকগোষ্ঠী কোন পথে ঠেলে দেয় সেটাই এখন দেখার বিষয়।

> “আমি খুলে বলছি। বিভিন্ন জাতিসত্তার কথা যে এখানে স্বীকৃত হয়নি, সে কথা আমি না বলে পারছি না। আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী। আমি সেখানকার উপজাতীয় এলাকার লোক। সেখানকার কোন কথাই এই সংবিধানে নাই। যুগে যুগে ব্রিটিশ শাসন থেকে আরম্ভ করে সবসময় এই এলাকা স্বীকৃত হয়েছিল; অথচ আজকে এই সংবিধানে সেই কথা নাই। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি কীভাবে ভুলে গেলেন আমার দেশের কথা–পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা। এটা আমার বিস্ময়।
>
> *– মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*”

জুম্মদের জাতিগত নির্মূলীকরণ ষড়যন্ত্রের পাঁচ দশক

নিপন ত্রিপুরা

জাতিগত নিধন বা নির্মূলীকরণের বিভিন্ন ধরনের টুলস আছে। ডেরেক এইচ হাভিসের মতে জাতিগত নির্মূলীকরণের চেষ্টা দুইভাগে ঘটে থাকে। একটি কারণ হচ্ছে উপযোগিতাবাদ বা ‘ইউটিলিটারিয়ান’ ধরনের। মূলত ভূমি, সম্পদ, দাস সংগ্রহের জন্য একটি জাতিকে নির্মূল করে দেওয়ার চেষ্টাকে উপযোগিতাবাদ জাতিগত নির্মূলীকরণ বলে। প্রাচীনকালে এই ধরনের জাতিগত নির্মূলের ঘটনা দেখা যেত। আরেকটি হচ্ছে মতাদর্শ বা ‘আইডিওলজিক্যাল’। মতাদর্শের জায়গা থেকে একটি গোষ্ঠী বা জাতি অপর বর্ণ, জাতি, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে নির্মূলের চেষ্টা করে থাকে। মূলত বিদ্যমান রাষ্ট্রে জাতিগত সামাজিক কাঠামো পরিবর্তন করে কোনো একটি জাতির একক কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য। তবে উভয় প্রকারের জাতিগত নির্মূলের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক বা রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে একক শক্তিশালী গোষ্ঠীর সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপন। (সূত্র: জাতিগত নির্মূল: বনি ইসরাইল থেকে রোহিঙ্গা; ড. মারুফ মল্লিক, প্রথম আলো; ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৭)।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অবস্থিত। বাংলাদেশের মোট এলাকার প্রায় এক-দশমাংশ। অনাদিকাল থেকে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, মুরুং, লুসাই, খুমি, চাক, খিয়াং, বম, পাংখুয়া নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভিন্ন ভাষাভাষি এগারোটি আদিবাসী জুম্ম জাতির আবাসস্থল। পাশাপাশি অল্প সংখ্যক সান্তাল, অসম ও গোর্খা আদিবাসী বাস করে। জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ধর্মে জুম্ম জনগণ বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের থেকে স্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্রতার কারণে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের উপর বাংলাদেশের উগ্র জাত্যভিমানী শাসকগোষ্ঠী জুম্মদের জাতিগত পরিচয় বিলুপ্ত করে দেয়ার ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের নিপীড়ন

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের জাতিগত নির্মূলীকরণের প্রথম দিক শুরু হয় ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের প্রাক্কালে। পাক বাহিনী চলে যাওয়ার পর মুক্তিবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় প্রবেশ করে জুম্ম জনগণের উপর সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত বিদ্বেষ নিয়ে। সংঘটিত করে হত্যা, লুঠপাট, অগ্নিসংযোগ ও জুম্ম নারীদের ধর্ষণ। ১৯৭১ সালের ৫ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী পানছড়ি রবিসিং কার্বারী পাড়া ও গোলক পতিমা ছড়ায় গণহত্যা চালায়। এতে ১৬ জন জুম্ম মারা যায়। দিঘীনালায় হামলা চালিয়ে ১৮ জন নিরীহ জুম্মকে হত্যা করে। ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে পানছড়ির কুকিছড়ায় মুক্তিবাহিনীরা গণহত্যা চালায়। এতে ২২ জন নিরীহ জুম্ম মারা যায়।

সাংবিধানিক স্বীকৃতি না দেয়া

সংবিধান একটা দেশের নাগরিকের রক্ষাকবচ। সাংবিধানিক স্বীকৃতিহীন একটি জাতিকে সহজে নির্মূল করা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের জাতিগত নির্মূলীকরণের দ্বিতীয় ধাপ হল জুম্ম জনগণের পক্ষে পেশকৃত এন এন লারমার চার দফা দাবি প্রত্যাখান করা এবং সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব ও শাসনতান্ত্রিক অধিকারের স্বীকৃতি না দেওয়া। পার্বত্য চট্টগামের জুম্ম জনগণ বাংলাদেশের বাঙালি জনগণের থেকে জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ধর্মে আলাদা ও স্বতন্ত্র। তাই তারা সংবিধানে জাতিগত পরিচিতি ও শাসনতান্ত্রিক অধিকারের স্বীকৃতি দাবি করেছিল।

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণ এই আশা পোষণ করেছিল যে, বাংলাদেশের নতুন শাসকরা তাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করতে পারবেন এবং জুম্ম জনগণের উপর সকল প্রকার নিপীড়ন ও বৈষম্যের অবসান করবেন। এরই পটভূমিতে ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি এম এন এন লারমার নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের একটি প্রতিনিধিদল পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্বলিত চারদফা দাবিতে একটি স্মারকলিপি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট পেশ করেছিলেন। এছাড়া এম এন লারমার নেতৃত্বে এক জুম্ম প্রতিনিধিদল সংবিধান প্রণয়ন কমিটির নিকটও নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের চারদফা দাবিনামা পেশ করেছিলেন। কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারক-বাহক সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী চায়নি জুম্মরা সমান অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকুক। তাই তাদের অস্তিত্ব সুরক্ষার বিষয়ে সংবিধানে একটি শব্দও লিপিবদ্ধ করতে এগিয়ে আসেনি। বরং ‘বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন’ মর্মে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করে জুম্ম জনগণের উপর বাঙালিত্ব পরিচয় চাপিয়ে দেয়া হয়।

দীর্ঘ বছর পর ২০১১ সালে সরকারের সেই ঐতিহাসিক চরম

ভুল শোধরানোর সুযোগ আসে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে সাংবিধানিকভাবে জুম্মদের জাতিগত স্বীকৃতি প্রদান ও সংবিধানে পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮-এর আইনী হেফাজত প্রদানসহ পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ শাসিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান দাবি করা হয়েছিল। কিন্তু আওয়ামীলীগ সরকার সেই দাবিনামার প্রতি কোনরূপ তোয়াক্কা না করে জুম্ম জাতিসসমূহ-সহ দেশের আদিবাসী জাতিসমূহ উল্টো ‘উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়’ ইত্যাদি অপমানসূচক পরিচিতি প্রদান করে। অপরদিকে ‘বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালি এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন’ মর্মে সংবিধানে নতুন করে সংযোজনের মাধ্যমে জুম্ম জনগণসহ অবাঙালি জাতিগোষ্ঠীকে আবার বাঙালি বলে পরিচিতি প্রদান হয়। এটা নি:সন্দেহে জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূল করে একক আধিপত্যবাদী বাঙালিত্বের শাসন প্রতিষ্ঠার নামান্তর। অথচ ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের নির্বাচরী ইশতেহার-২০০৮-এ সাংবিধানিক- ভাবে আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের প্রতিশ্রুতি ছিল।

সামরিকীকরণ

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের জাতিগত নির্মূলীকরণের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হল পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিকায়ন করা। সামরিক উপস্থিতির বিচারে আদিবাসী জুম্ম জাতিগোষ্ঠীর আবাসভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল হচ্ছে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সামরিকায়িত অঞ্চল। ১৯৯০ সালে প্রকাশিত পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের ‘জীবন আমাদের নয়’ (লাইফ ইজ নট আওয়ারস) রিপোর্টে জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতি ৬ জন জুম্ম ব্যক্তির পেছনে একজন সেনা সদস্য নিয়োজিত ছিল বলে উল্লেখ করা হয়। ইবগিয়া কর্তৃক ২০১২ সালে প্রকাশিত ‘মিলিটারাইজেশন ইন দা চিটাগং হিল ট্যাক্টস, বাংলাদেশ’ শীর্ষক রিপোর্ট-১৪ অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরে প্রতি ৪০ জন জুম্ম ব্যক্তির পশ্চাতে একজন সৈন্য নিয়োজিত আছে।

বস্তুত জুম্ম জনগণের স্বায়ত্তশাসনের দাবি পরিপূরণের পরিবর্তে সামরিকায়নের মাধ্যমে একের পর এক সরকার সাম্প্রদায়িক ও ফ্যাসীবাদী দমন নীতি গ্রহণ করে থাকে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালের গোড়ার দিকে দীঘিনালা, রুমা এবং আলিকদমে তিনটি সেনানিবাস প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলে জরুরী অবস্থা জারি করা হয়। শুরু হয় রাজাকার, মুজাহিদ দমনের নামে নিরীহ নিরপরাধ জুম্ম জনগণের উপর নানাবিধ অত্যাচার, নিপীড়ন ও নির্যাতন। এরপর আশির দশকে জিয়াউর রহমান ও সামরিক শাসক এরশাদের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক সামরিকায়ন ঘটে।

সেনাবাহিনীর কার্যক্রমকে জোরদার করার জন্য জিয়াউর রহমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেন। এই উন্নয়ন বোর্ডকে সামরিক বাহিনীর চলাচলের জন্য রাস্তাঘাট নির্মানসহ জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব বিধ্বংসী কার্যক্রমে ব্যবহার করা হয়। গোড়া থেকেই উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় সেনাবাহিনীর ২৪তম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি’কে। জিয়াউর রহমানের শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে ১,১৫,০০০ সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়। প্রতি ৬ জন জুম্মের পেছনে একজন সেনা। পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে স্থাপন করা হয় ৫০০ এর বেশি সেনাক্যাম্প। আশির দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ঘোষণা করা হয় উপদ্রুত এলাকা হিসেবে এবং অপারেশন দাবানল নামে সেনা শাসন জারী করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর চুক্তি অনুযায়ী অপারেশন উত্তরণসহ সকল অস্থায়ী সামরিক, আনসার এবং ভিডিপির ক্যাম্প প্রত্যাহারের কথা বলা আছে। চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে ৬টি স্থায়ী সেনানিবাস থাকতে পারবে। সেগুলো হলো রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান তিন জেলায় তিনটি সেনা ব্রিগেড এবং আলিকদম, রুমা ও দীঘিনালা তিনটি সেনানিবাস। সরকারের মতে, প্রায় ৫০০ শতাধিক অস্থায়ী ক্যাম্প হতে ২৪০টি ইতিমধ্যে প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু জনসংহতি সমিতির মতে, তিন দফায় মাত্র ১০০টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছিল। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো ৪০০-এর অধিক অস্থায়ী ক্যাম্প রয়েছে। অধিকন্তু ক্যাম্প প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া ২০০৯ সাল থেকে বন্ধ রয়েছে। ইতিমধ্যে প্রত্যাহৃত অনেক ক্যাম্প আবার পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। কেবল সম্প্রতি ২০১৯ সাল থেকে বিগত তিন বছরে ২০টির অধিক নতুন ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

পার্বত্য চুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন ইনসার্জেন্সী না থাকলেও তৎকালীন সরকার ‘অপারেশন দাবানল’ এর স্থলে ২০০১ সালে ‘অপারেশন উত্তরণ’ প্রবর্তন করে। উক্ত ‘অপারেশন উত্তরণ’-এর বদৌলতে সেনাবাহিনী সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, উন্নয়ন, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি অবৈধভাবে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। ২০১৫ সালের ৭ জানুয়ারি পার্বত্য চুক্তি-পরবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অনুষ্ঠিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সভায় গোয়েন্দা বাহিনীর রিপোর্টের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত ১১টি নির্দেশনা গ্রহণ করা হয়। এর ৫ নম্বর সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, ‘কোন দেশি-বিদেশি ব্যক্তি কিংবা সংস্থা কর্তৃক পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতীয়দের সাথে সাক্ষাৎ কিংবা বৈঠক করতে চাইলে

স্থানীয় প্রশাসন এবং সেনাবাহিনী অথবা বিজিবির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে’। এ ধরনের সিদ্ধান্ত বা নির্দেশনা নি:সন্দেহে চরম জাতিবিদ্বেষী ও বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বহি:প্রকাশ এবং জাতিগত নির্মূলীকরণেরই অন্যতম নীলনক্সা বলে নির্দ্বিধায় বলা যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ব সময়ে নিরাপত্তা বাহিনী ও মুসলিম সেটেলারদের দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামের কলমপতি, লোগাং ও লংগদুসহ ১৫টি গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল। এতে কয়েক শত জুম্ম অধিবাসীকে হত্যা করা হয়। সেই সময় বহিরাগত মুসলিম সেটেলাররা নিরাপত্তা বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় জুম্মদের উচ্ছেদের লক্ষ্যেই গ্রামের পর গ্রাম অগ্নিসংযোগ ও আক্রমণ করেছিল। শুধু তাই নয়, জুম্ম জনগণের উপর নিরাপত্তা বাহিনী ও মুসলিম সেটেলারদের বর্বরোচিত হামলার শিকার হয়ে ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত অন্তত ৯ বার দফায় দফায় দেড় লক্ষাধিক জুম্ম প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। পার্বত্য চুক্তি-উত্তর সময়ে বিগত ২৩ বছরে জুম্মদের উপর ২০টির অধিক সাম্প্রদায়িক হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এতে জুম্মদের শত শত ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এমনকি ২০১৩ সালে মাটিরাঙ্গায় তাইন্দং সাম্প্রদায়িক হামলা ও অগ্নিসংযোগের ফলে শত শত জুম্ম গ্রামবাসী ভারতের ত্রিপুরার সীমান্তে কাঁটাতার সংলগ্ন এলাকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। (সূত্রঃ পার্বত চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি)।

বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাশাসনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে সম্পূর্ণভাবে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করা এবং জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের কাজ পরিচালনা করা, ধীরে ধীরে পাহাড়ে জুম্ম জনসংখ্যা শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা এবং বাঙালি সেটলারদের জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার মতো কার্যক্রম পরিচালনা করা। এই কাজটি বৈধতা দিতে নিরাপত্তা বাহিনীকে পাহাড়ের প্রাকৃতিক সম্পদ যেমনঃ পাথর উত্তোলন, বনভূমি উজার, পর্যটন শিল্প, বাঁশ-কাঠ পাচার, বনাঞ্চল ধ্বংস করে রাস্তাঘাট নির্মাণসহ বহুমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে হাসিলের লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। এক কথায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরাপত্তা বাহিনী একদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে চলেছে, অন্যদিকে ডেভেলাপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ত্বরান্বিত করতে পর্যটন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, ক্যাম্প সম্প্রসারণ, বনজ সম্পদ পরিবহন নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি তথাকথিত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে।

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সেটেলার পুনর্বাসন

পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটেলার পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে জুম্মদের জাতিগত নির্মূলীকরণের কার্যক্রম শুরু হয় ’৪৭ সালে দেশ বিভাগের অব্যবহিত পর পকিস্তান সরকারের জমানায়। তৎসময়ে ৯৮.৫% অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জুম্মদেরকে জাতিগত নির্মূল করার লক্ষ্যে পাকিস্তান সরকার প্রথমে ফ্রন্টিয়ার পুলিশ রেগুলেশন বাতিল করে পার্বত্য চট্টগ্রামের পুলিশ বাহিনী বিলুপ্ত করে ও দেশ ভাগের সময় ভারত থেকে আসা মুসলিম শরণার্থীদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় বসতি প্রদান করে। ভারত থেকে আগত শত শত মুসলিম পরিবারসহ সমতল জেলার অসংখ্য মুসলিম বাঙালি পরিবারকে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত করে এবং বর্তমান বান্দরবান পার্বত্য জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি ও লামা এবং বর্তমান রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার নানিয়ারচর ও লংগদুতে তাদের বসতি স্থাপন করে।

তাতেও পাকিস্তানি সরকার ক্ষান্ত না হয়ে ষাট দশকে কাপ্তাইয়ে কর্ণফুলী নদীতে হাইড্রো-ইলেকট্রিক ড্যাম নির্মাণ করে চুয়ান্ন হাজার একর (৫৪,০০০) ধান্যজমি হ্রদের পানিতে তলিয়ে দেয়া হয়। এতে প্রায় এক লক্ষ জুম্ম আদিবাসী পৈতৃক জমি ও বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ করা হয়। ফলে উদ্বাস্তু জুম্মরা নিরুপায় হয়ে দেশ ছেড়ে প্বার্শবতী ভারত ও মিয়ানমারে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। পাকিস্তান সরকার তার এই জাতিবিধ্বংসী ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করতে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিতে জুম্মদের যে সামান্যতম রক্ষাকবচ অটুট ছিল, সেই রক্ষাকবচকে সংশোধন করে বহিরাগত মুসলিম জনগোষ্ঠীর অবাধ অনুপ্রবেশের পথ প্রশস্ত করে দেয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম (ভূমি অধিগ্রহণ) অধ্যাদেশ ১৯৫৮ জারী করে জুম্মদের ভূমি হুকুমদখল এবং তাদেরকে স্বভূমি থেকে উচ্ছেদের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে।

বাংলাদেশ সরকারের শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে সামরিকীকরণের পাশাপাশি ইসলামিকীকরণের নীতি বাস্তবায়নের জন্য জেনারেল জিয়াউর রহমান সরকার ১৯৭৯ সালে সমতল থেকে ১,২৭,৮১০ জন সেটেলার পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় পুনর্বাসন করে। তারই ধারাবাহিকতায় স্বৈরশাসক এরশাদ সরকার ১৯৮২-১৯৮৪ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার লক্ষ সমতলের হতদরিদ্র মুসলিমকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতিপ্রদান করে। তার জন্য প্রত্যেক পরিবারকে ৫ একর টিলা, ৪ একর উচুনিচু ভূমি অথবা ২.৫ একর চাষযোগ্য ভূমি এবং নগদ টাকা ও ৬ মাসের রেশন সরবরাহ করা হয়। তবে এখনো পর্যন্ত সেটেলারদের রেশন প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এসব সেটেলারদেরকে অধিকাংশ নদী

উর্বর উপত্যকায় বসতি প্রদান করা হয়। এরই মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্ধেক ভূমি মুসলিম বসতিকারী মুসলিমদের দখলে চলে যায়। [সূত্র: Anti Slavery Society 1984: Appendix 1]

পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৪-১৯৯১ সালে প্রায় ৫০,০০০ এবং ১৯৯১-১৯৯৬ সালে প্রায় ১০,০০০ সেটেলারকে বসতিপ্রদান করে। পার্বত্য চুক্তির পরও সমতল অঞ্চল থেকে হতদরিদ্র মুসলিমদের সমতল অঞ্চল থেকে পাহাড়ে বসতিপ্রদানের প্রক্রিয়া নানাভাবে চলমান থাকে। সেটেলাররা পাহাড়ে বসতি গড়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে ডেমোগ্রাফিক পরিবর্তন হয় দ্রুত। আদিবাসী জুম্মরা দ্রুত সংখ্যালঘুতে পরিণত হতে থাকে। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম ও বাঙালি জনসংখ্যার অনুপাত ৭৭:২৩ শতাংশ; ১৯৮১ সালে ৫৮:৪২; সর্বশেষ ২০১১ সালে জুম্ম ৫২.৯ এবং বাঙালি ৪৭.১ শতাংশ বলে জানা জায়। (তথ্য: পিসিজেএসএস ও আদমশুমারী)।

সমতল ভূমি থেকে আসা এসব সেটেলাররা জুম্মদের ভূমি বেদখল, সাম্প্রদায়িক হামলা, লুটপাট, জুম্ম নারী ধর্ষণ, হত্যা ইত্যাদি কার্যক্রমে অদ্যাবধি চালিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর সেটেলাররা ২০টির অধিক সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত করেছে। শুধু তাই নয়, নিরাপত্তা বাহিনীর ছত্রছায়ায় বাঙালি মুসলিম সেটেলাররা উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠন পার্বত্য গণ পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাঙালি ছাত্র পরিষদসহ অনেক ভূঁইফোড় সংগঠন গড়ে তুলে সাম্প্রদায়িক বিষপাষ্প ছড়াতে থাকে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্টপোষকতায় গড়ে উঠা পার্বত্য গণ পরিষদ, পার্বত্য বাঙালি ছাত্র পরিষদ, বাঙালি ছাত্র ঐক্য পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলন ইত্যাদি সংগঠনগুলোকে বিলুপ্ত করে সাম্প্রদায়িক চেতনাধারী, জুম্ম বিরোধী ও শাসকগোষ্ঠীর এজেন্ডা বাস্তবায়নকারী একক সংগঠন হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ গঠন করা হয়। যার কাজ হচ্ছে পার্বত্য চট্টগাম চুক্তি বাস্তবায়নের বাধা দেয়া এবং চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম পরিচালনা করা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে আনুষ্ঠানিক বৈঠক চলাকালে উভয় পক্ষ এই মর্মে অলিখিত চুক্তিতে উপনীত হয়েছিল যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতিস্থাপনকারী সেটেলারদের সমতলে খাস জমিতে সম্মানজনক পুনর্বাসন করা হবে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী অদ্যাবধি সেটেলারদের সমতলে পুনর্বাসন করেনি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা দিন দিন জটিলতর হচ্ছে এবং জুম্মদের ক্রমান্বয়ে সংখ্যালঘু করে জাতিগত নির্মূলের কার্যক্রম নীরবে বাস্তবায়িত হতে থাকে।

অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে মৌলবাদী ও জুম্ম বিদ্বেষী ইসলামী মৌলবাদী গোষ্ঠী কর্তৃক সুপরিকল্পিতভাবে আদিবাসী জুম্মদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হচ্ছে। আর্থিক সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, গৃহ নির্মাণ, গরু-ছাগল পালন, সুদমুক্ত ঋণ ইত্যাদি প্রলোভন দেখিয়ে বান্দরবান জেলায় ধর্মান্তরকরণ চলছে। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে রোয়াংছড়ি উপজেলার আলেক্ষ্যং ইউনিয়নের ছাংলাওয়া পাড়ায় (শীলবান্ধা পাড়া) ৫ মারমা পরিবারের ২৭ জনকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে।

এছাড়াও লেখাপড়া শেখানোর লোভ দেখিয়ে আদিবাসী ছেলেমেয়েদেরকে তাদের মাতা-পিতা থেকে নিয়ে ঢাকা, গাজীপুরসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় পিতা-মাতার অজান্তে মাদ্রাসায় ভর্তি করানো এবং ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অন্যদিকে জুম্ম নারীদেরকে ফুসলিয়ে কিংবা ভালবাসার প্রলোভন দেখিয়ে বিয়ে করা এবং ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার অনেক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামাইজেশনের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে বান্দরবান জেলায় ‘উপজাতীয় মুসলিম আদর্শ সংঘ’, ‘উপজাতীয় মুসলিম কল্যাণ সংস্থা’ ও ‘উপজাতীয় আদর্শ সংঘ বাংলাদেশ’ ইত্যাদি সংগঠনের নাম দিয়ে উপজাতীয় নুও মুসলিম জনবসতিও গড়ে তোলা হয়েছে এবং এসব সংগঠনের মাধ্যমে জুম্মদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণের কাজ চালানো হচ্ছে। বর্তমানে বান্দরবান পৌর এলাকার বাস ষ্টেশনে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত ৩০ পরিবারের অধিক ত্রিপুরা ও খিয়াং এবং টাংকি পাড়ায় ১৫ পরিবারের নুও ত্রিপুরা মুসলিম, লামার লাইনঝিড়িতে ১৭ পরিবারের অধিক ত্রিপুরা মুসলিম ও গয়ালমারায় ৪৫টি পরিবার, আলিকদম-থানচি সড়কের ক্রাউডং (ডিম পাহাড়) এলাকায় ১৬ পরিবার ত্রিপুরা মুসলিম, আলিকদম-থানচি সড়কের ১১ কিলো এলাকায় আরো ৪৫ পরিবারের নুও মুসলিমের বসবাস রয়েছে।

ভূমি বেদখল ও পর্যটন স্থাপনা

একটি জাতিকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার অন্যতম হাতিয়ার হল ভূমি দখল করা এবং ভূমিপুত্রদের উচ্ছেদ করা। ভূমি বেদখলের মধ্য দিয়ে একটি জনগোষ্ঠীকে তাদের চিরায়ত জায়গা-জমি থেকে সহজেই বিতাড়িত করা যায়। চাষযোগ্য ও বাসযোগ্য ভূমির স্বল্পতা, আদিবাসীদের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়াদি বিবেচনা করে বৃটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে শাসন বহির্ভূত অঞ্চল ঘোষণা করে এ অঞ্চলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দা নয় এমন ব্যক্তিদের স্থায়ীভাবে বসবাসে

নিষিদ্ধ করেছিলেন। এটি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও তাদের অস্তিত্ব রক্ষার এক রক্ষাকবচ ছিল। এই রক্ষাকবচ খর্ব করতে বিভিন্ন সরকারের আমলে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিকে জুম্ম জনগণের মতামত না নিয়ে শাসকগোষ্ঠী তাদের ইচ্ছেমাফিক কাটাছেঁড়া করে। এধরনের রক্ষাকবচ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে নানাভাবে এখনো বলবৎ রয়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও এর যথার্থ প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। ভারতের অরুণাচল, মিজোরাম, মেঘালয় ইত্যাদি রাজ্যে, রাজ্যের বাসিন্দা নয় এমন ব্যক্তি ভূমির মালিকানাস্বত্ব অধিকার পায় না। এমনকি রাজ্যের বাসিন্দা নয় এমন ব্যক্তি অরুণাচল, মিজোরাম ইত্যাদি রাজ্যে প্রবেশ করতে চাইলে রাজ্যের কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করতে হয়। ভারতের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে এখনো এ ধরনের আইন ও ব্যবস্থা রয়েছে যা আদিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে এই রক্ষাকবচ (শাসন বহির্ভূত অঞ্চল) রহিত হবার কারণে আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অস্তিত্ব বিপন্ন এবং আদিবাসীরা প্রতিনিয়ত স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে।

১৯৬৪-৬৬ সনে কানাডার ফরেস্টাল ফরেস্ট্রি এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টারন্যাশন্যাল লিমিটেড এর ভূমি জরিপ রিপোর্ট অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে জমির পরিমাণ ২৪,৯২,২৬৬ একর। পার্বত্য চট্টগ্রামে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ এমনিতেই অত্যন্ত কম। আবার ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের ফলে প্রথম শ্রেণির আবাদী জমির ৪০ শতাংশ (৫৪ হাজার একর জমি) কাপ্তাই বাঁধের পানিতে তলিয়ে যায়। পরিমাণ মতো চাষযোগ্য জমি না থাকায় উদ্বাস্তু জুম্ম পরিবারসমূহকে ভূমি বন্দোবস্তী প্রদান পূর্বক যথাযথ পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়নি। ফলে হাজার হাজার জুম্ম পরিবার ভূমিহীন হয়ে যায়। বিদ্যমান এই ভূমি সমস্যার পালে হাওয়া লাগিয়ে এ সমস্যা আরও প্রকট করে তোলে জিয়াউর রহমান ও এরশাদ সরকার চার লক্ষাধিক বহিরাগত বাঙালি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে জুম্মদের ঐতিহ্যগতভাবে ভোগ দখলীয় ও রেকর্ডীয় জমির উপর বসতিপ্রদান করে।

বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের সমতল এলাকার ভূমি ব্যবস্থাপনা থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা। ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতেও সেই স্বতন্ত্র ভূমি ব্যবস্থাপনা বজায় রাখা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক প্রণীত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ (১৯৯৮ সালে সংশোধিত) এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮ অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রিত হয় বিশেষ শাসনব্যবস্থার অধীনে প্রতিষ্ঠিত স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ও প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, যার মধ্যে রয়েছে জেলা পর্যায়ে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও অঞ্চল পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, এবং রাজা, হেডম্যান এবং কার্বারীর মতো প্রথাগত প্রতিষ্ঠান। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি পার্বত্য জেলা পরিষদের হস্তান্তরিত বিষয় হলেও এখনো তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনাররা এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে চলেছে। ফলে পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক প্রণীত আইন লঙ্ঘন করে ডেপুটি কমিশনাররা পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বহিরাগতদের নিকট বন্দোবস্তী, হস্তান্তর, ইজারা প্রদান করে চলেছে। এছাড়া ডেভেলোভমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অংশ হিসেবে রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণাসহ নানা প্রকল্পের নামে পার্বত্য জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতীত ডেপুটি কমিশনাররা ভূমি অধিগ্রহণ করে চলেছেন।

অন্যদিকে মুসলিম সেটেলার ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জুম্মদের জায়গা-জমি জবরদখলের ফলে সৃষ্ট ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য পার্বত্য চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের বিধান করা হয়। পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের ১৮ বছর পর অবশেষে ২০১৬ সালে উক্ত ভূমি কমিশন আইন যথাযথভাবে প্রণীত হয়। কিন্তু তারপর সরকার উক্ত ভূমি কমিশনের বিধি প্রণয়নে আবারও গড়িমসি করে চলেছে। ফলে এখনো পর্যন্ত ভূমি কমিশনের বিধি প্রণীত না হওয়ায় ভূমি কমিশন ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিচারিক কাজ শুরু করতে পারেনি। বিগত ২৩ বছরেও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়ায় ভূমি বিরোধকে কেন্দ্র করে সরকার ও জুম্ম জনগণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি-বাঙালির মধ্যে প্রতিনিয়ত সংঘাত ও হানাহানি বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সেই সাথে রিজার্ভ ফরেষ্ট, পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ, শিল্পভিত্তিক ভূমি ইজারা, নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যবহারের জন্য ভূমি বেদখল, আমলাসহ বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানী কর্তৃক ভূমি বেদখল অব্যাহত রয়েছে। ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়টি তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের হস্তান্তরিত বিষয় হলেও কার্যত তা মানা হচ্ছে না।

ভূমি জবরদখলের সর্বশেষ উদাহরণ হচ্ছে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে থেকে বান্দরবানের চিম্বুক পাহাড়ে নীলগিরিতে জুম্মদের জায়গার উপর সেনাবাহিনী কর্তৃক পাঁচতারকা হোটেলসহ বিলাসবহুল পর্যটন কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্যোগ। এই হোটেল নির্মাণের ফলে প্রত্যক্ষভাবে ম্রোদের চারটি পাড়া এবং পরোক্ষভাবে অসংখ্য পাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

প্রায় ১০,০০০ জুমচাষি উদ্বাস্তু হওয়ার ঝুঁকিতে পড়বে। ম্রোদের জুমভূমি ও মৌজা ভূমির উপর বিলাসবহুল পাঁচতারা হোটেল নির্মাণের পরিকল্পনা বাতিল করার জন্য স্থানীয় ম্রো জনগোষ্ঠীসহ দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রবল দাবি করা সত্ত্বেও সেনাবাহিনী হোটেল নির্মাণের কাজ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনায় আইন ও রীতি না মেনে রাষ্ট্রযন্ত্রের ছত্রছায়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিত্বের প্রভাব খাটিয়ে জুম্মদের ভূমি বেদখল করাও জুম্মদের জাতিগত নিধন করার আরেকটি অস্ত্র, যা দেশের শাসকগোষ্ঠী জোরালোভাবে প্রয়োগ করে চলেছে। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের পরিবর্তে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও সংস্কৃতি বিধ্বংসী তথাকথিত উন্নয়ন কার্যক্রম (ডেভেলাপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং) গ্রহণের মাধ্যমে জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হয়ে চলছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে কালক্ষেপণ করা

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষরের অব্যবহিত পরে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির কিছু ধারা-উপধারা বাস্তবায়িত হলেও এখনো দুই-তৃতীয়াংশ ধারা অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে। বিশেষ করে ২৩ বছরেও চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ সম্পূর্ণ অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়ে গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত মূল বিষয়সমূহের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা; পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন ও পরিবেশ, পর্যটন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদিসহ রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও কার্যাবলী হস্তান্তর করা; নির্বাচন বিধিমালা ও ভোটার তালিকা বিধিমালা প্রণয়নপূর্বক তিন পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং তদনুসারে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা; 'অপারেশন উত্তরণ' নামক একপ্রকার সেনাশাসনসহ সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা; ভূমি কমিশনের মাধ্যমে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করে বেহাত হওয়া জায়গা-জমি জুম্মদের নিকট ফেরত দেয়া; ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের তাদের স্ব স্ব জায়গা-জমি প্রত্যর্পণ পূর্বক যথাযথ পুনর্বাসন প্রদান করা; অস্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত ভূমি ইজারা বাতিল করা; পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকরিতে জুম্মদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করা; চুক্তির সাথে সঙ্গতি বিধানকল্পে ১৮৬১ সালের পুলিশ এ্যাক্ট, পুলিশ রেগুলেশন ও ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য অন্যান্য আইন সংশোধন; পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সেটেলার বাঙালিদের সম্মানজনক পুনর্বাসন করা ইত্যাদি অন্যতম।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরকারী সরকার প্রায় ১৩ বছর ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় রয়েছে। এই দীর্ঘ ১৩ বছর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেও চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে এগিয়ে আসেনি।

একদিকে তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারগণ ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির দোহাই দিয়ে পূর্বেকার মতো জেলার সাধারণ প্রশাসন সম্পর্কিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করে চলেছেন, অন্যদিকে আঞ্চলিক পরিষদের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনের এখতিয়ারকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এবং দলীয়করণের মাধ্যমে সরকারের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে অগণতান্ত্রিক উপায়ে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ইহার সামগ্রিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

অপরদিকে ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী এবং আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স গঠিত হলেও টাস্কফোর্সকে পর্যাপ্ত তহবিল, প্রয়োজনীয় জনবল ও পরিসম্পদ বরাদ্দ করা হয়নি। ফলে আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু ও ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের তাদের স্ব স্ব জায়গা-জমি প্রত্যর্পণ পূর্বক পুনর্বাসনের কাজ এখনো যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। ভারত-প্রত্যাগত ১২,২২২ শরণার্থী পরিবারের মধ্যে এখনো ৯,৭৮০ পরিবার তাদের ধান্যজমি, বাগান-বাগিচা ও বাস্তুভিটা ফেরৎ পায়নি। এছাড়া প্রত্যাগত শরণার্থীদের ৪০টি গ্রাম সেটেলারদের বেদখলে রয়েছে এবং স্বউদ্যোগে ও ১৬-দফা প্যাকেজ চুক্তি মোতাবেক প্রত্যাগত প্রায় ৫৪ হাজার শরণার্থী রেশন প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত রয়েছে। অপরদিকে এখনো জুম্ম (উপজাতীয়) আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা হয়নি। ফলে জুম্ম উদ্বাস্তুরা এখনো দুর্গম পাহাড়ে ও রিজার্ভ ফরেস্টে শিক্ষা, চিকিৎসা, উন্নয়ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে।

পার্বত্য চুক্তিতে তিন পার্বত্য জেলায় স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের ক্ষমতা তিন সার্কেল চীফের উপর অর্পণ করা হলেও

সরকার চুক্তির এই বিধানকে সম্পূর্ণভাবে লঙ্ঘন করে ২১ ডিসেম্বর ২০০০ এক কার্যাদেশের মাধ্যমে তিন সার্কেল চীফের পাশাপাশি তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারদের স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করে। বার বার দাবি করা সত্ত্বেও শেখ হাসিনা সরকার এই অবৈধ ও চুক্তি বিরোধী আদেশ বাতিল করেনি। এই আদেশের ফলে ডেপুটি কমিশনাররা রোহিঙ্গাসহ বহিরাগত লোকদেরকে পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র দিয়ে চলেছেন এবং এই সনদপত্রের বদৌলতে স্থানীয়দের অধিকার খর্ব করে বহিরাগতরা পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকরি, ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, ভূমি মালিকানাসহ নানাবিধ সুবিধা লাভ করে চলেছে, যা পার্বত্য চুক্তির সাথে সম্পূর্ণ বিরোধাত্মক।

বর্তমানে শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামীলীগ সরকার পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের পরিবর্তে বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক সামরিকায়ণ করে ফ্যাসীবাদী কায়দায় দমন-পীড়নের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের নীতি অনুসরণ করে চলেছে। ফলে জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকসহ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে সোচ্চার ব্যক্তি ও সংগঠনকে ক্রিমিনালাইজ (অপরাধীকরণ) করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে 'সন্ত্রাসী', 'চাঁদাবাজ', অস্ত্রধারী দুর্বৃত্ত' ইত্যাদি আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে একের পর এক সাজানো মামলা দায়ের করা, তাদের ঘরবাড়ি তল্লাসী ও জিনিষপত্র তছনছ করা, অস্ত্র গুঁজে দিয়ে গ্রেফতার করা, ক্রসফায়ারের নামে গুলি করে হত্যা করা, ক্যাম্পে নিয়ে মারধর করা ইত্যাদি নিপীড়ন-নির্যাতন চালানো হচ্ছে।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের পরিবর্তে বর্তমান সরকার পূর্ববর্তী স্বৈরশাসকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক সামরিকায়ণ করে ফ্যাসীবাদী কায়দায় দমন-পীড়নের মাধ্যমে, জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও সংস্কৃতি বিধ্বংসী তথাকথিত উন্নয়ন কার্যক্রম (ডেভেলাপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং) গ্রহণের মাধ্যমে, ভূমি বেদখল ও জুম্মদেরকে তাদের চিরায়ত ভূমি থেকে উচ্ছেদের মাধ্যমে, জুম্মদের উপর বাঙালি মুসলিম সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে, বহিরাগত মুসলিম জনগোষ্ঠী বসতিপ্রদান ও অনুপ্রবেশের মাধ্যমে, সর্বোপরি পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রমের মাধ্যমে পাঁচ দশক ধরে দেশের একের পর এক শাসকগোষ্ঠী জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করে চলেছে।

বলাবাহুল্য, এধরনের জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের ষড়যন্ত্র বিশ্বের কোন দেশেই শুভ ফল বয়ে আনেনি। দেশের শাসকগোষ্ঠীর পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে জাতিগত নির্মূলীকরণের ষড়যন্ত্রও দেশের বৃহত্তর স্বার্থে কোন শুভ ফল বয়ে আনেনি তা বিগত পাঁচ দশকের পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি দেখলেই সহজেই বুঝা যায়। দেশের এক-দশমাংশ পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘাত ও হানাহানি জারি রেখে দেশে কখনোই প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম হতে পারে না তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। পাঁচ দশক ধরে জুম্ম জনগণের অবিরাম প্রতিরোধ সংগ্রাম থেকে শাসকগোষ্ঠীর এই শিক্ষা নেয়া উচিত। বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যার যথাযথ রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের কোন বিকল্প নেই তা দেশের শাসকগোষ্ঠী যতই দ্রুত উপলব্ধি করতে পারবে, ততই দ্রুত দেশের জন্য মঙ্গলজনক হবে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

> “গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের উত্তরণ হবে আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশে। ...আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র হবে, দেশে অভাব থাকবে না, হাহাকার থাকবে না, মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ থাকবে না, হিংসা, দ্বেষ, বিদ্বেষ—কিছুই থাকবে না। শুধু থাকবে মানুষে মানুষে প্রেম, প্রীতি, মায়া, মমতা এবং তার দ্বারা এক নতুন সমাজ গড়ে উঠবে। মানবতার এই ইতিহাস থাকবে এবং তাতে লেখা থাকবে 'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই'। আমি আজ কামনা করি, তাই হোক।
>
> *সংবিধান-বিলের উপর ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে এম এন লারমার গণপরিষদে প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ*”

জাতি ও জাতীয়তা প্রসঙ্গে

ক্যবামং মারমা

জাতি সম্পর্কে সবচেয়ে আধুনিক ও গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দেন তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতা যোসেফ স্টালিন। তিনি বলেন, জাতি হলো যারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে অধিবাসী, ঐতিহাসিকভাবে ঐক্য। যাদের অর্থনৈতিক জীবন ও ভাষা এক, সংস্কৃতি ও একই মানসিক গড়ন। তাঁর মতে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, ঐতিহাসিক ঐক্য, এক অর্থনৈতিক জীবন ও ভাষা, সংস্কৃতি ও একই মানসিক গড়ন- এই চারটি উপাদান থাকলে ঐ জনগোষ্ঠীকে জাতি বলা যায়।

এখন বিচার করা যাক, মারমা একটি জাতি কিনা। মারমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি আছে এবং মানসিক গড়ন মোটামুটি এক, এক অর্থনৈতিক জীবন, ভাষা আছে (পূর্বে জুম চাষই ছিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বর্তমানে কেউ জমি, কেউ বাগান, কেউ চাকরি, এখন কেউ ব্যবসা করে), লেখার বর্ণমালা আছে, ঐতিহাসিক ঐক্যে ছিল এবং এখনো মোটামুটি ঐক্য আছে (শুধুমাত্র সুবিধাবাদী ও দালাল ব্যক্তিগণ ব্যতীত)। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ক্ষেত্রে বর্তমানে মারমাদের ভূখণ্ড হিসেবে বোমাং সার্কেল (বোমাংথঙ) ও মং সার্কেল (প্যালেঙথঙ) - এই দু'টোকে বলা যায় না। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তৃত এলাকায় মারমারা বসবাস করে থাকে। মারমাদের নিজস্ব সরকার নেই। তবে ব্রিটিশ শাসনামল বা এর পূর্বে মারমাদের সরকার ছিল। কিন্তু সরকারের স্বরূপ প্রশাসনিক ও বিচারিক পদ্ধতি এখনো বিদ্যমান রয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের কারণে যারা ক্ষমতা বা অধিকার হারিয়েছে তারা আদিবাসী হিসেবে গণ্য হওয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি অন্যতম শর্ত। এতে দেখা যায়, সরকার ছাড়া জাতি হওয়ার অধিকাংশ শর্তই মারমারা পূরণ করেছে।

বাঙালি জাতি গঠিত হয়েছে বাংলা ভাষার ভিত্তিতে। বাঙালি হলো ভাষাভিত্তিক জাতি। তারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। কেউ ইসলাম, কেউ হিন্দু, কেউ বৌদ্ধ। বর্তমানে খ্রিষ্টানও প্রচুর রয়েছে। বড়ুয়া হলো বৌদ্ধ। ১৭৫৭ সালে ইংরেজদের হাতে নবাব সিরাজুদ্দৌলা পতন হওয়ার ঘটনাকে বাংলার আকাশে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয় বলে ইতিহাস রচিত হলেও সেটি বাঙালির রাষ্ট্র ছিল বলে বলা যায় না। কেননা সিরাজুদ্দৌলা ছিল বাংলা (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গসহ), বিহার ও উড়িষ্যার শাসক ও নবাব এবং মোগল বংশধর। সিরাজুদ্দৌলা জাতিতে বাঙালি ছিল না।

নবাব বা সুবেদার হলো সম্রাটের অধীন শাসক। সুবে অর্থাৎ অঞ্চল বা তালুকের শাসক। এই সুবেদার শব্দটি পূর্বে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে প্রচলন ছিল। ক্যাম্পের দ্বিতীয় কর্মকর্তাকে সুবেদার বলা হতো। বর্তমানে সেনাবাহিনীতে এ পদবীকে ওয়ারেন্ট অফিসার বলা হয়। পুলিশের ক্ষেত্রে বলে সেকেন্ড অফিসার। এটি ইসলামি ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী নামকরণ করা হয়েছে। মারমাদের আকাশে স্বাধীনতার সূর্য কবে অস্তমিত গেছে তা কেউ সঠিকভাবে বলতে পারে না। হয়তো মারমারা দীর্ঘকাল ঘুমিয়ে ছিল, নয়তো মদের বোতল বা নিজের পেটের দিকে চেয়ে মগ্ন ছিল অথবা চোখ বন্ধ করে ধ্যানমগ্ন ছিল। তাই তারা অনুধাবন করতে পারেনি।

দেখা যায়, জাতির অন্তঃকলন ও বহিঃঃকলন ঘটে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, মারমারা আরাকানে গেলে রাখাইন হয়ে যায়। অতীতে দক্ষিণাঞ্চলের অর্থাৎ বান্দরবানের মারমারা খাগড়াছড়ির মারমাদেরকে আলাদা জাতি মনে করতো। বান্দরবানের মারমারা খাগড়াছড়ির মারমাদেরকে মারমা বলতো না, বলতো প্যালেঙস্বাঃ। এই 'স্বাঃ' শব্দটি আলাদা জাতি পরিচয়ে ব্যবহার করা হতো। এখনো রাখাইনস্বাঃ বললে মারমারা একই জাতির লোকজন মনে করে না। রাখাইনরাও একই জাতির লোকজন মনে করে না। এখন আবার প্যালেঙস্বাঃ, ককদেংস্বাঃ, মারোস্বাঃ, লেঃম্রোটস্বাঃ, স্বাকপ্রেগ্যা, রিগ্রেস্বাঃ, লংকডুংস্বাঃ সবাইকে মারমা জাতির সন্তান বা মারমা জাতির লোক বলে। 'স্বাঃ' শব্দটি এখন গোত্র হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। এমনকি এখন ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের মগদেরও মারমা জাতি হিসেবে বলা হয়। রাখাইন, মোন, কারেন, কোচিন, শ্যাম, খিয়াং (বার্মিজ উচ্চারণে চিন), কয়াঃসহ বহু জাতিদের নিয়ে মায়ানমার জাতি গঠিত হয়েছে। এটি অন্তঃকলনের ঘটনা (Inner acception)।

যদিও মারমারা মগ হবে নাকি মারমা হবে, তা নিয়ে বিতর্ক চলমান রয়েছে। মারমারা রাখাইন নাকি রাখাইনরা মারমা, তা নিয়ে বর্তমানে বিতর্ক রয়েছে। ত্রিপুরারা মারমাদের মারমাস্বাঃ বলে। আবার চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা এক জাতি হিসেবে ভাবা হতো। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে তঞ্চঙ্গ্যারা আলাদা জাতি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এটি বহিঃকলনের ঘটনা (Outer acception)। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, বম, খিয়াং, খুমী, চাক, পাংখোয়া, লুসাই দশ ভাষাভাষী দশটি জাতিকে নিয়ে জুম্ম জাতি গঠন করে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র আন্দোলন করেছে। জুম্ম জাতিকে মারমা ভাষায় বলে তঙস্বাঃ (တောင်သား, শব্দগত অর্থ হয় পাহাড়ের সন্তান)।

১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে সশস্ত্র আন্দোলন অবসান করে জনসংহতি সমিতি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে ফিরে আসে। চুক্তির পর তঞ্চঙ্গ্যা জাতিকে নিয়ে ভিন্ন ভাষাভাষী এগারোটি জাতি নিয়ে জুম্মজাতির ধারণা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এরপরেও পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে সাঁওতাল, অহমিয়া, গোর্খা ও রাখাইনদেরও স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এই হিসেবে জুম্ম জাতিসত্তা এখন ১৪টি। এটি অন্ত:কলনের ঘটনা। দেখা যায়, অন্ত:কলন করলে জনসংখ্যার বিচার জাতির আকার বৃদ্ধি পায়। বহিঃকলন করলে জাতির আকার কমে যায়। জুম্ম জাতি একদিকে জাতি রূপে, আরেকদিকে আন্তর্জাতীয় রূপে গঠিত। জাতির মধ্যে জাতি। জুম্ম জাতির ভিত্তি হচ্ছে তাদের অভিন্ন জীবনধারা ও অর্থনৈতিক জীবন। জুম্ম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন চলছে এবং এতে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।

পৃথিবীর কোনো দেশই বর্তমানে এক জাতির এক দেশ নেই। কোনো দেশে একটি মাত্র জাতি বাস করে না। আমেরিকা ইংরেজ, ইহুদি, ফরাসি, স্পেনিস, জার্মান, কালো মানুষদের দেশ। তারা ঐতিহাসিক ঐক্যের দ্বারা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমেরিকান জাতি গঠন করেছে। চীন হান, মাঞ্চু, হুই, তিব্বতীসহ বহু জাতি নিয়ে গঠিত হয়েছে। ভারতে মারাঠি, তামিল, বাঙালি, ত্রিপুরাসহ বহু জাতির বসবাস এবং তারা নিজেদেরকে ভারতীয় বলে পরিচয় প্রদান করে। পাকিস্তানেও তাই। পাকিস্তানে উর্দু, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, সারাইব, পাশতু, বেলুচি, ব্রাহুই ইত্যাদি ভাষাভাষি জাতি রয়েছে। কিন্তু তাদের জাতীয়তা পাকিস্তানী।

কিন্তু বাংলাদেশে? একদল বলে বাঙালির দেশ। তাই জাতি হবে বাঙালি। আরেকদল বলে বাংলাদেশের জাতি হবে বাংলাদেশী। তারা জাতিতে বাংলাদেশী বললেও সাধারণ বাংলাদেশী নয়, বিশেষ বাংলাদেশী অর্থাৎ ইসলামি বাংলাদেশী জাতিকে বুঝায়। তাঁরা ইসলামি ধ্যান-জ্ঞান তাস চোরের মতো ইসলামি ট্রাম্প কার্ড জামার পকেটে লুকিয়ে রাখে। যখন প্রয়োজন তখন তা কাজে লাগায়। মুখে বাংলাদেশী বললেও মনেপ্রাণে বাংলাদেশী নয়। দেশের অন্যান্য জাতিদের স্বীকার করে না। তাদের অধিকারের স্বীকৃতি দিতে চায় না। দুই দলই যতটা পারে দেশের অন্যান্য জাতিদের ধ্বংস করতে চায় বা ধ্বংস করে চলেছে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এমন যে, সম্ভব হলে কাল-পরশুর মধ্যেই অন্য জাতিদের ধ্বংস করে দিতে পারলেই মুক্তি। কিন্তু বিশ্ব পরিস্থিতি ও তাদের দুর্বলতার কারণে অন্য জাতি ধ্বংসের কার্যক্রম কৌশলগতভাবে ধীর লয়ে (Slow poisoning) বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

জাতির অন্ত:কলনে এমনিতেই জাতির উপাদানগুলো ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে এবং অন্ত:কলনের কাজকে সহজ করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো মারমা যদি আরাকানে বা বার্মায় বছরখানেক বসবাস করে তাহলে তাকে চেনা যাবে না সেই ব্যক্তি রাখাইন নাকি বার্মিজ। আর তা না হয়ে কোনো মারমা বা জুম্ম যদি বাঙালি সমাজে যায় তাহলে তাকে পরিষ্কারভাবে চেনা যায় সেই পুরুষ বা নারী বাঙালি নয়। যেমন কাকের দলে একটা বককে দূর থেকেও স্পষ্ট চেনা যায়। দেখা যায়, এখনো পর্যন্ত বড়ুয়াদেরকে অন্য বাঙালিরা মগ বলে থাকে। আবার জুম্মদের মধ্যেও যতটা সহজে চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, চাকদের সাথে মারমাদের জাতি অন্তঃকলন হতে পারে, বম, ত্রিপুরা, পাংখোয়াদের সাথে ততটা নয়। তাই বাঙালি, ইংরেজ, কালো মানুষদের সাথে মারমা জাতির অন্তঃকলন মোটেই সহজ হবে না। প্রায়ই অসম্ভব বলা চলে। জাতি অন্তঃকলন মানে অন্য জাতিতে মিশে যাওয়া নয়। অন্তঃকলনে জাতির আকার ও শক্তি বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

জাতিকে মায়ানমার ভাষায় অম্যোঃস্বাঃ বলাই সঠিক শব্দ। অম্যোঃ মানে আত্মীয়, স্বাঃ মানে সন্তান। জাতির সন্তান হলে, জাতিতে বসবাস করলে, জাতির সদস্য হলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক হবে আত্মীয় বা আপন লোকের মতন। একে অপরের মধ্যে সুখ-দুঃখের অনুভব হবে। একে অপরের উন্নতিতে সুখানুভব হবে, ক্ষতিতে দুঃখানুভব হবে।

আবার জাতি হলো সমগ্র বা সমষ্টি, ব্যক্তি হলো জাতির অংশ। সমগ্রের উন্নতিকে জাতির উন্নতি বলে। এক ব্যক্তি বা কয়েক জনের উন্নতিকে জাতির উন্নতি বলে বিবেচনা করা যায় না। তাই জাতির কাজ বা জাতি উন্নতির কাজ বলতে সমগ্রের উন্নতিকে ভাবা হয়। এই কারণে জাতির উন্নতির জন্য প্রয়োজনে ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি বা স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে হয়। এমনকি নিজের জীবনকেও বিলিয়ে দিতে হয়। এজন্যে জাতির বীর বা সূর্য সন্তানগণ জাতির উন্নতি বা মুক্তির জন্য নিজের জীবনকে নিঃসংকোচে বিলিয়ে দিয়ে থাকে। তাদের আত্মত্যাগের ফল জাতি ভোগ করে। জাতিও তাদের বীর সন্তানদের ত্যাগ ও অবদানকে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। যারা সেরূপ করে না তাদের অকৃতজ্ঞ সন্তান বলা হয়। আর যারা জাতির সূর্য সন্তানগণের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা জাতির নিকট অপরাধী হয়। তখন ব্যক্তি নিজেকে জাতি থেকে আলাদা করতে পারা যায় না। জাতি তাদের শাস্তি বিধান করে।

অংশ সব সময় সমগ্রের অধীনে থাকে। অংশ যদি সমগ্রের উপরে চলে যায় বা অংশের স্বার্থ যদি সমগ্র স্বার্থের চেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয় তাকে সঠিক বলা যায় না, বলা হয় অনিয়ম। অনিয়ম হলে সমগ্রের ক্ষতি হয়। জাতি দুঃখে নিমজ্জিত হয়। কেউ কেউ জাতির একজন লোকের উন্নতিকে জাতির উন্নতি

মনে করে এবং মনে করিয়ে দিতে চায়। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, সবাইয়ের একসাথে সমান উন্নতি হবে না। তা হতে পারে না। এমন ইতিহাস মানব সমাজে নেই। জ্ঞান, গুণে, ক্ষমতায় এক একজনের এক একভাবে হয়। কিন্তু লোকটির উন্নতি হওয়ার পরে তার কার্যকলাপ ও নীতি-আদর্শ কীরূপ, সেটিই বিচার্য বিষয়। উদাহরণ স্বরূপ, ইংল্যান্ডের রাজাও ইংরেজ ছিল আর ক্রমওয়েলাও ইংরেজ ছিল। এদিকে দিয়ে দেখলে রাজার উন্নতি ইংরেজ জাতির উন্নতি। কিন্তু প্রজাদের দুঃখ-কষ্ট বেড়ে যাওয়ায় তখন তাকে ইংরেজ জাতির উন্নতি বলে ধরা হয় না। তার কারণে ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে বিদ্রোহ হয়, হয় বিপ্লব। এর ফলে রাজার ক্ষমতার পতন ঘটে। প্রজাদের সাথে চুক্তি করতে হলো। সেই চুক্তিকে ম্যাগনেকার্টা চুক্তি বলে। বাংলাদেশেও গোলাম আজমরা বাঙালি ছিল। বাঙালির উন্নতি বা স্বার্থকে মূল্য না দিয়ে ব্যক্তিগত ও গুটিকয়েক ব্যক্তির স্বার্থকে মূল্য দেয়ায় জাতীয় দালাল হিসেবে পরিগণিত হয়।

শোনা যায়, মিজোদের মধ্যে জাতি অনুভূতি সবচেয়ে বেশি প্রবল। অন্য জাতির লোকের দ্বারা মিজো লোকের কিছু হলে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে। যে যেভাবে পারে সাহায্য করতো এবং অন্যদের মোকাবেলা করতে স্বজাতির লোকদের পক্ষে অগ্রসর হতো। মিজো মানে পাহাড়ি মানুষ। মি মানে পাহাড়, জো মানে মানুষ। অর্থাৎ জুম্ম বা তঙস্বাঃ। শোনা যায়, অতীতে মারমারা লুসাইদের হাতে হত্যার শিকার হতো। আক্রমণকারী লুসাইরা মারমা নারী-পুরুষ ধরে নিয়ে যেতো এবং দাসদাসী বানাতো।

জাতির লোকজনের সুখ-দুঃখ নিয়ে চিন্তা করা, উন্নতি-কল্যাণ কামনা করা, ভাষা সংস্কৃতি জ্ঞানের উন্নতি করতে ইচ্ছা করা, বিপদের কথা ভাবা ও তাতে সাড়া দেয়াই হলো জাতীয়তা (အမျိုးသားစု, অম্যোঃস্বাঃজুট)। জাতীয়তা শুধু পরিচয়বাহক নয়। নিজে বাঁচলে বাপের নাম, অন্যরা মরলে মরুক, সবাই মরলে আমিও মরব আর কি, নিজের পেট দেখে থাকা লোকদের চিন্তা-চেতনাকে জাতীয়তা বলে না। শুধু নিজের স্বার্থে কাজ করে যাওয়া, একজন বা অল্প কয়েকজনের উন্নতির জন্য কাজ যাওয়াকেও জাতীয়তা বলে না। জাতীয়তা দুর্বল হলে জাতিও দুর্বল হয়। জাতীয়তা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে যেতে থাকলে জাতির বিপন্ন হয়ে পড়ে। জাতির লেবাসে ব্যক্তিটিই থেকে যায়। তখন সেই ব্যক্তি জাতিকে দোষারোপ করে, নিজের জন্মকে ভুল মনে করে। মনিষীরা বলে গেছেন, 'জন্ম হোক যথাতথা, কর্ম হোক ভালো'। এজন্যই জাতির কল্যাণ ও উন্নতির জন্য জাতীয়তা প্রয়োজন।

জাতীয়তা উন্নতির জন্য জাতীয়তাবোধের উন্নতি করতে হয়। যে যে জাতিতে জন্ম নিয়েছে তাকে সে জাতির লোকজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা রাখতে হয়, সংস্কৃতি ও ভাষাকে ভালোবাসতে হয়, বিপদের চিন্তা করতে হয়। কোনো না কোনো সময়ে কেউ না কেউ অবশ্যই অল্প পরিমাণে হলেও উপকার বা সাহায্য করে থাকবে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা রাখতে হবে। নিজের জাতির অবস্থা যদি ভাল না হয়, তাহলে নিজের কর্তব্য-দায়িত্ব উপলব্ধি করতে পারতে হয়। শুধু জাতির কাছে চাওয়া, নিজে জাতিকে দেয়ার চিন্তা না করতে পারা সভ্য মানুষের চরিত্র নয়। আর অন্য জাতির অল্প উপকারকে বিরাট করে দেখা, নিজেদের বিরাট উপকারকে ছোট করে দেখা হলো চরম অকৃতজ্ঞতা ও বেহায়াপনা।

জাতীয়তাবাদ চর্চার মাধ্যমে জাতীয়তা শক্তিশালী হয়ে উঠে। জাতীয়তাবাদকে মায়ানমার ভাষায় বলে অম্যোঃস্বাঃওয়াদা (အမျိုးသားဝါဒ)। স্বজাতির মঙ্গল ও অগ্রগতি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা এবং সচেতনতা হলো জাতীয়তাবাদ। এটি একটি রাজনৈতিক-সামাজিক দর্শন বা আদর্শ ও নীতি। মারমা ভাষায় আদর্শকে সবঃত্রাঃ (သဘောတရား), সংক্ষেপে ত্রাঃ (တရား); আর নীতিকে (Principles) ওয়াদাট (ဝါတ) বলে থাকে। জাতীয়তাবাদকে রাজনীতিতে ব্যবহার বেশি দেখা যায়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নীতি-আদর্শ বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাঙালি জাতীয়তা; বিএনপি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের কথা বলেও তাদের নীতি-আদর্শ ইসলামি জাতীয়তাবাদ (ইসলাইম বাস্বা অম্যোঃস্বাঃ ওয়াদাট, အစ္စလမ်ဘာသာ အမျိုးသား ဝါဒ) ও ইসলামি জাতীয়তা (ইসলাইম বাস্বাম্যোঃজুট, အစ္စလမ် ဘာသာ မျိုးစု); জনসংহতি সমিতির নীতি-আদর্শ জুম্ম জাতীয়তাবাদ ও মানবতাবাদ।

আরও জানা যায় যে, মগ পার্টি নামে সরকারি বাহিনী ও ক্ষমতাসীন দলের মদদপুষ্ট একটা সশস্ত্র সংগঠন রাঙ্গামাটির রাজস্থলী এলাকাতে রয়েছে। ঐ সংগঠনের নীতি-আদর্শ কী, তা জানা যায়নি। তবে তাদের কার্যকলাপ থেকে লক্ষ করা যায় তাদের নীতি স্বাক (চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাকে মারমারা স্বাক বলে) জনগোষ্ঠীর বিরোধিতা করা। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা আলাদা জাতি দাবি করলেও মারমাদের কাছে তারা এক জাতি। এ দলটি মগ বা মারমা জাতীয়তা ও মগ জাতীয়তাবাদের কথা বলে থাকে। আবার সরকারী বাহিনী বা ক্ষমতাসীন দলের আশ্রয়ে থাকে। এ দলের সদস্যরা স্বাক বিরোধিতার নামে জনসংহতি সমিতির কার্যক্রম বানচাল করা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরোধিতার কাজে লিপ্ত রয়েছে।

এ দলটি মগ জাতীয়তাবাদের কথা বললেও মগ বা মারমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি-অগ্রগতির কথা বলতে বা কর্মসূচি নিতে শোনা যায় না। তাদের বলতে শোনা যায়, তারা মারমাদের মেম্বার-চেয়ারম্যান করে দেবে। এই চেয়ারম্যান-মেম্বার করে দেয়ার কাজও

বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় মারমাকে চেয়ারম্যান-মেম্বার করা নয়, কেবল জুম্ম অধ্যুষিত এলাকাতেই করার কথা বলে থাকে। মূলত তাদের কাজ হলো পাহাড়ি বা জুম্ম অধ্যুষিত এলাকায় ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে কাজ করা। ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ প্রার্থী দীপঙ্কর তালুকদার এই দলটিকে তার পক্ষে নির্বাচনী কাজে ব্যবহার করেন। বর্তমানে মগ পার্টি সরকারী বাহিনী ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হয়। ফলে বুঝা যায়, মগ পার্টির লক্ষ্য হলো শাসকগোষ্ঠীর সাথে মিলেমিশে মারমাদেরকে আওয়ামীলীগীকরণে দালালি ভূমিকা পালন করা।

আওয়ামী লীগ দলটির নীতি হচ্ছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ (কল্লাঃ অম্যোঃস্বাঃ ওয়াদাট, ကလ္လား အမျိုးသား ဝါဒ) ও আদর্শে বিশ্বাসী হচ্ছে বাঙালি জাতীয়তায় (কল্লাঃ অম্যোঃজুট, ကလ္လား အမျိုးစု)। বর্তমানে দলটিতে অনেক পাহাড়ি বা জুম্ম কাজ করে থাকে। এদের কেউ কেউ বড় নেতা অর্থাৎ এমপি-মন্ত্রী এবং জুম্ম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পরিচালিত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত স্বশাসিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান- মেম্বারের ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করছে। মনে রাখতে হবে, অধিকারের অপরদিক ক্ষমতা। আওয়ামী জুম্মরা আওয়ামী লীগের নীতি-আদর্শ জানে কিনা, তা আমি জানি না। তাদের কার্যকলাপ দেখে জানা যায়, আওয়ামী মারমাদের নীতি হলো স্বাকসহ (তারা আবার স্বাক বলতে চাকমাদের বুঝায়) অন্যান্য জুম্মদের বিরোধিতা এবং নিজের দলের পক্ষ বাদে অন্য সমস্ত বিপক্ষ পার্টির বিরোধিতা করা। তবে জনসংহতি সমিতি নেতাদের লক্ষ্য রেখে চাকমাদের বিরোধিতার কথা অধিকতর বলে থাকে, যেহেতু জনসংহতি সমিতিতে প্রধান নেতা ও সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা-কর্মী হচ্ছে চাকমা। আবার চাকমা আওয়ামী লীগ হলে ঠিক আছে। তবে নিজ নিজ অঞ্চলে অন্য জুম্মদের বিরোধিতা করে থাকে। অন্যান্য জুম্মরাও সেরূপ। কিন্তু বাঙালিদের বিরোধিতা করে না। তারা চাকমা বিরোধিতার নামে মারমা জাতীয়তার কথা বলে। আবার জনসংহতি সমিতির মারমা নেতা হলেও তার বিরোধিতা করে। অথবা আওয়ামী জুম্মদের নীতি বা ওয়াদাট হলো টন-মণ, চাকরি ও পদ লাভ করা। আদর্শে স্বজাতির অস্তিত্ব, অবস্থা-ব্যবস্থা, অধিকার ব্যাপারে বিচার-বিবেচনা না করা ও কথা না বলা। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তার অবিরোধিতা করা এবং তার পথ মসৃণ করে দিয়ে জুম্মদের অস্তিত্ব বিপন্ন করা।

অন্যান্য আওয়ামী জুম্মদেরও নীতি হলো মারমা অধ্যুষিত এলাকায় গোপনে মারমাদের বিরোধিতা, প্রকাশ্যে চাকমা বিরোধিতা করা। তাদেরও বিরোধিতার লক্ষ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বের উপর চড়াও হওয়া অথবা টাকা-চাকরি ও পদ পাওয়া। ব্যক্তি স্বার্থে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তার আগ্রাসনকে নিবরে প্রশ্রয় দেয়া। তারা স্বজাতির কথা বললেও সে জাতীয়তা সমস্ত জাতিকে বুঝায় না, বুঝায় সে নিজেকে। যেহেতু সে-ও একজন মারমা বা জুম্ম। তাঁর উন্নতি মানে মারমা বা জুম্মর উন্নতি। বিএনপি জুম্মদের ক্ষেত্রেও একই চরিত্র বিদ্যমান। মানুষের চরিত্রে একটা নিয়ম হচ্ছে, ‘যুক্তির (Reason, အကျိုးအကြောင်း, অক্যোঃঅক্রং) বিপরীতে অজুহাত (Excuse, အခွင့်အလမ်း, অখোয়াঙলাইম)’। বাঙালি জাতীয়তাবাদের আগ্রাসনকে প্রশ্রয় দেয়া অথবা শত্রুকে সহযোগিতা দিয়ে স্বজাতির কথা বলা যুক্তি নয়; তা হলো অজুহাত তুলে ধরা।

‘পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নীতিতে জুম্ম জাতীয়তাবাদ (তঙস্বাঃ অম্যোঃ ওয়াদাট, တောင်သား အမျိုး ဝါဒ); আদর্শে মানবতাবাদ (লুস্বাঃম্যোঃজুট, လူသားမျိုးစု)।’ এর বাক্যের ‘মানবতাবাদ (লুস্বাঃম্যোঃজুট, လူသားမျိုးစု)’ পরিবর্তে হবে ‘মানবতাবাদ (လူသားဝါဒ লুস্বাঃওয়াদাট’। দলটি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতির অস্তিত্ব রক্ষা ও স্বাধিকারের কথা বলে এবং স্বাধিকার অর্জনের জন্য আন্দোলন-সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। এ দলটি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণের একটি রাজনৈতিক সংগঠন। এ দলে কোনো কোনো জাতি থেকে বেশি, কোনো কোনো জাতি থেকে কমসংখ্যক সদস্যরা রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সদস্য হলো চাকমা জাতির। চাকমারা জনসংখ্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে সবচেয়ে বেশি। সম্ভবত পাঁচ লাখের উর্ধ্বে। দ্বিতীয়তে আছে মারমারা। জনসংখ্যায় সম্ভবত তিন লাখের মধ্যে (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুসারে, নিরাপত্তার কারণে ভিন দেশে পাড়ি দেয়ার ফলে বর্তমানে আরো কমে যেতে পারে)। এটা ঠিক যে, জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে সবাই যে খাঁটি জুম্ম জাতীয়তাবাদী, তা কিন্তু নয়। কোন কোন চাকমা সদস্যদের মধ্যে চাকমা জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা, কোন কোন মারমা সদস্যদের মধ্যে মারমা জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা, কিংবা ত্রিপুরা সদস্যদের মধ্যে ত্রিপুরা জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা প্রবল থাকে। তবে কমবেশি সবার মধ্যে জুম্ম জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা বিরাজমান রয়েছে।

মানবতা হলো জনসংহতি সমিতির অন্যতম আদর্শ। মানবতা আদর্শের প্রতি সকলেই সচেতন এমনটা বলা যাবে না। নীতি-আদর্শকে সামনে রাখা হয় সমাজ ও মানুষের বিকাশের বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে। বিকাশ উর্ধ্বমুখী হয়, নিম্নমুখী হয় না। নিম্নমুখিতাকে বিকাশ বলা হয় না, বলা যায় অধঃপতন। নীতি বলুন বা আদর্শ বলুন অথবা জ্ঞান বলুন, সেগুলো অর্জনের বিষয়; তা মানুষের সহজাত নয়। অনুশীলনের মাধ্যমেই

নীতি-আদর্শ বা গুণ-জ্ঞান অর্জন করা যায়, অর্জিত হয়ে থাকে। মানুষের আদর্শ-নীতিকে ব্যক্তির চরিত্রে পাওয়া যাবে। ব্যক্তি চরিত্রকে কথার মাধ্যমে নয়, কাজে বা কার্যকলাপের মাধ্যমে পরিচয় মেলে। মুখের কথায় বিশ্বাস করলে প্রতারিত হতে হয়। আবার মানুষকে বিশ্বাস না করেও পারা যায় না। এটি এক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা বাদ দিন, প্যালেমথণ্ডকে বাদ দিন, বোমাংথণ্ডকেও মারমা জাতির ভূখণ্ড বা আবাসভূমি বলা যায় না। রাঙ্গামাটিকেও চাকমা জাতির ভূখণ্ড বলা যায় না। বলতে হবে, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি আদিবাসী বা জুম্ম জাতির ভূখণ্ড বা আবাসভূমি। এ ভূখণ্ডের অধিকার বা মালিকানা জনসংখ্যায় কম জাতি বম, লুসাই, খুমি, চাক, পাংখোয়া, খিয়াংদেরও স্বীকার করতে হবে। বাঙালিদের ব্যাপারটি ভিন্ন। একসময় পার্বত্য চট্টগ্রামে কোনো বাঙালি ছিল না। ব্রিটিশ শাসনামলের শেষদিকে বাঙালি মাত্র শতকরা দুইজন ছিল বলে ইতিহাস থেকে জানা যায়। তাই রাজনীতি ও অর্থনীতি চর্চার ক্ষেত্রে জুম্ম জাতীয়তাবাদী আদর্শ চর্চায় হবেই সঠিক নীতি।

জনসংহতি সমিতির আদর্শ হলো মানবতাবাদ। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জাতীয়তাবাদ ও মানবতা নীতি-আদর্শ যদি সঠিক হয়, তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জাতিগুলোর স্বজাতির চর্চা জুম্ম জাতীয়তাবাদ ও মানবতা নীতি-আদর্শের অধীনতা স্বীকার করা অপরিহার্য। জুম্ম জাতীয়তাবাদ ও মানবতা নীতি-আদর্শকে ক্ষতি না করে স্বজাত্য চর্চা করা সঠিক হবে। অন্যথায় তা হবে যুক্তি নয়, হবে অজুহাত, তার ফল হবে ক্ষতিকারক। আবার জাতীয়তাবাদ ও মানবতা চর্চা মানে একে অপরকে দমিয়ে রাখা, পিছন থেকে ধরে রাখাকে বুঝায় না, একে অপরকে বিকাশ লাভ করতে সহযোগিতা দেয়া এবং একাত্মতা ঘোষণা করে সমর্থন প্রদান করাকেই বুঝায়।

আবার কেউ করে দেবে বলে মনে করে আশায় আশায় অপেক্ষা করে থাকাও ভুল হবে। নিজের কাজ নিজেকে করতে হয়। এটাই মুখ্য। অপরের কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়াও যেতে পারে, আবার না-ও পাওয়া যেতে পারে। তবে সঠিক নিয়ম-নীতির লঙ্ঘন করা চলবে না। সঠিক নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধে গেলে ক্ষতিই হয়। যুক্তিতে না যেয়ে অজুহাতে গেলে ক্ষতি হয়। যুক্তিবিহীন বা যুক্তির বিপক্ষে কাজ করলে একজন বা অল্পজনের সাময়িক লাভ হতে পারে। কিন্তু সমগ্রের অর্থাৎ সমাজ-জাতির দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি হয়। এই ক্ষতি পূরণ করতে সমগ্রের অনেক সময় চলে যায়; কখনো কখনো তা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সকলকে জগতের বিকাশের নিয়মকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। বিকাশের মধ্য দিয়েই মানব ও মানব সমাজ আজকে এই পর্যায়ে পৌঁছেছে। সামনে আরও অগ্রসর হবে। কেউ কেউ বলেন, রাখাইন বা মারমা রাজ্যের সীমানা ঢাকা পর্যন্ত ছিল। ডখ্রাঃ (দা বা তলোয়ার দিয়ে ভাগ করা) থেকে ঢাকা নামের উৎপত্তি। হতে পারে, অসম্ভব নয়। কিন্তু তা এখন হারিয়ে যাওয়ার ইতিহাস। অধঃপতনের ইতিহাস, বিকাশের ইতিহাস নয়। ঢাকা সীমানার ইতিহাস কেবল বলে থাকলে, বর্তমান ইতিহাসকে না দেখলে, অতীত থেকে শিক্ষা না নিলে এবং অতীত-বর্তমান অবস্থা বা ইতিহাসের আলোকে ভবিষ্যতের অবস্থা ও পথ না দেখলে তা হলো মূর্খতা। এসব নিয়ে তর্ক করে নয়, বিতর্ক করেই সমাধানে পৌঁছতে হবে।

সমাজে ও রাজনীতিতে শত্রু-মিত্র নির্ধারিত হয় দর্শনের দ্বারা, আদর্শ দ্বারা। মিত্রের সাথে সম্পর্ক রক্ষা ও শত্রুর সাথে দ্বন্দ্বের মীমাংসা করাই হলো আদর্শ পদ্ধতি। তা না হলে সঠিকভাবে শত্রু-মিত্র চেনা, নিজেকে সঠিকভাবে চেনা ও সঠিকভাবে দ্বন্দ্বের মীমাংসা করা সর্বদা ভুল হয়ে যাবে।

> “দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া যে কত বড় মারাত্মক, তা বলে শেষ করা যায় না। দুর্নীতি যদি আমরা দূর করতে না পারি, তাহলে সরকার যত রকমের আইনই করুক না কেন, যত কড়া নির্দেশনামাই দিক না কেন, কোন সুরাহা হবে না। আজকে এই দুর্নীতি সবখানে। ..এই দুর্নীতিকে আঁকড়ে ধরে যারা কালো টাকা রোজগার করে, আইনের ছত্রছায়ায় তাদেরকে রক্ষা করা হয়। – *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*”

পাহাড়ের তরুণদের স্বপ্ন

সঞ্জীব দ্রং

১.

মানুষকে স্বপ্ন দেখতে হয়, স্বপ্ন নিয়েই বেঁচে থাকতে হয়। এই স্বপ্ন হলো শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্যহীন অন্যরকম এক পৃথিবী ও সমাজের স্বপ্ন। সুন্দর আনন্দময় জীবনের স্বপ্ন। আমরা বলি, অন্যরকম পৃথিবী গড়া সম্ভব, another world is possible. সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই, এমন কথা আমরা পড়েছি। কথাগুলো সুন্দর এবং পৃথিবীটা এমন হলে ভালো হতো, আকাশ সীমার এক পৃথিবী রক্ত সবার লাল, চাঁদ সুরুজের আরতি হয় সন্ধ্যা ও সকাল। অথবা কত ভাষা কত বর্ণ, কত কথার ঢল, কান্দিলে সবার চোখে ঝরে একই জল। কিন্তু এমন হয় না মানুষের পৃথিবীতে। এখানে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, জাতিতে জাতিতে, মানুষে মানুষে বৈষম্য-ভেদাভেদ আছে এবং এই বৈষম্য বাড়ছে। আফগানিস্তানের নারী আর নরওয়ের নারীর অধিকার ও মর্যাদা সমান নয়। কিছুদিন আগে তালেবানদের ভয়ে আফগানিস্তানের পুরো মেয়েদের ফুটবল টিমকে দেশান্তর হতে হলো। তাদের আশ্রয় দিয়েছে পর্তুগাল। একজন হাজং বা খুমী মেয়ের অধিকার আর অটোয়ার একজন সাদা মেয়ের মর্যাদা রাষ্ট্রে সমান নয়। দুঃখ হলেও রাষ্ট্র ও পৃথিবীর এই বৈষম্যপীড়িত অবস্থায় আমরা বেঁচে আছি, বেঁচে থাকি। আমাদের মতো দেশে রাষ্ট্রের আচরণ আদিবাসীদের মতো সংখ্যালঘুদের জন্য আরো কঠোর ও অমানবিক।

রাষ্ট্র অবলীলায় কত সহজে একটি জাতির পরিচয় বদলে দেয়। সাংবিধানিকভাবে এই মুহূর্তে ৫০টির অধিক আদিবাসী জাতির নাগরিকরা 'বাঙালি।' পঞ্চদশ সংশোধনীর ৬(২) ধারায় বহাল তবিয়তে আছে, 'বাংলাদেশের জনগণ জাতিতে বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবে।' এ নিয়ে আমি প্রথম আলোতে আমার 'দেশহীন মানুষের কথা' কলামে বিস্তারিত লিখেছি। সংবিধান, দেশ ও জাতি নিয়ে পাহাড়ি তরুণদের ভাবতে হবে। তারা কি সংবিধান পড়ে দেখেছে? এ নিয়ে বিশ্লেষণ, আলোচনা করেছে? আত্মপরিচয় ও তার সংকট নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে তরুণ আদিবাসী সমাজকে। তা না হলে আমরা হারিয়ে যাবো। এর মধ্যে শহর এলাকাসহ অনেক গ্রামে আদিবাসী শিশুরা মাতৃভাষা চর্চা থেকে বহুদূরে চলে গেছে যা খুব উদ্বেগজনক। এভাবেই ধীরে ধীরে একেকটি জাতিসত্তা পৃথিবী থেকে হারিয়ে যায়।

জাতিসংঘ স্বীকার করেছে, বিশ্বব্যাপী আদিবাসী মানুষ ঐতিহাসিক কারণে শোষণের শিকার। আদিবাসীদের ভূমি, আদিবাসীদের ভূখণ্ড, আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও সম্পদ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বহু দেশে আদিবাসীদের উপর চরম মানবাধিকার লংঘিত হয়েছে। তাই আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আদিবাসীরা দিন দিন প্রান্তিক অবস্থানে চলে গেছে। এসব কারণে জাতিসংঘ তার সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে গত প্রায় বিশ বছর ধরে বলে আসছে আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হওয়ার জন্য। বলাইবাহুল্য, আমাদের রাষ্ট্র এ পর্যন্ত যথাযথ ভূমিকা পালন করেনি। উল্টো আদিবাসীদের 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' বলা হচ্ছে। তাই এখানে আদিবাসী জীবন ও সংগ্রাম কঠিনতর। তবু আমাদের পথ চলতে হয়। নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভাবতে হয়। আমাদের সন্তানেরা যেন মানুষের মর্যাদা নিয়ে এখানে বড় হতে পারে। শহরে এসে যে ছেলেমেয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পায়, তাদের দায়িত্ব আগামী দিনে অনেক বেশি। তারা যেন ভুলে না যায়, তাদের বাবা-মা, পূর্বপুরুষেরা অনেকে শহরে পড়াশোনার সুযোগ পাননি। আজকের অনেক তরুণ শহরে বড় হচ্ছে। শৈশবে আমরা যে গ্রাম পেয়েছি, যে চিরসবুজ সুন্দর প্রকৃতি, জীবন ও সংস্কৃতি দেখেছি মানুষের, তা হয়তো এরা পায়নি, কিন্তু আধুনিক শহর সভ্যতায় তারা বেড়ে উঠছে। এখন প্রয়োজন হলো গ্রাম, আদিবাসী ঐতিহ্য ও জীবনের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের সেতুবন্ধন রচনা করা। আদিবাসী তরুণ সমাজ যেন শিকড়ের মূল্য অনুভব করতে পারে।

২.

নানা কারণে মানুষ গ্রাম ছাড়ে। এই ঢাকা শহরে কী পরিমাণ আদিবাসী মানুষ আছেন, তাদের অবস্থা কী, এই অভিবাসী আদিবাসীদের নিয়ে কোনো গবেষণা আছে কি? বাংলাদেশে মান্দিদের মধ্যে প্রথম কে গ্রাম ছেড়েছিলেন, আমার জানা নেই। সেটি কত সালে? জানি না কে বলতে পারবেন। আগামী দিনের নতুন কোনো তরুণ লেখক হয়তো এসব তথ্য বের করবেন। নিশ্চয় অনেক স্বপ্ন নিয়ে মান্দিরা এ শহরে এসেছেন। ভাবতে ভালো লাগে মান্দিরা দেশ ছেড়ে বিদেশেও অনেকে পাড়ি জমাচ্ছেন এবং তারা ভালো আছেন। আমি এই মান্দিদের দেখেছি ইউরোপে, আমেরিকায়, কানাডায়। গত জুন মাসে দেখে এলাম অস্ট্রেলিয়ায়। সিডনী শহরে মান্দি তরুণ ছেলেমেয়েরা কী চমৎকার তাদের জীবন শুরু করেছে। অনেক বড় স্বপ্ন তাদের চোখেমুখে। তারা সবাই স্বনির্ভর এখন। কেউ বাড়ি থেকে টাকা নেয় না। উল্টো পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ করে কিছু অর্থ দেশে বাবা-মাকে পাঠায়। এই ঢাকা শহরে

আমি আদিবাসী তরুণদের এগিয়ে চলা দেখে মুগ্ধ হই। ওদের আমরা বড়রা খুব বেশি সহায়োগিতা করি না বা করতে পারি না। শহরে তেমন পরিবেশও নেই। এ ঢাকা শহরে আদিবাসী তরুণদের একত্রে বসে একটু সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভালো সময় কাটানোর মানসম্মত জায়গা বা সেন্টার নেই। বিদেশে প্রতিটি এলাকায় 'কম্যুনিটি সেন্টার' জাতীয় ব্যবস্থা আছে। এমনকি ভারতেও বিভিন্ন শহরে 'মেঘালয় হাউস' ধরনের ব্যবস্থা আছে। আড়ংসহ বড় বড় শপিং সেন্টারে মান্দি ছেলেমেয়েরা এখন সুনাম ও দক্ষতার সহিত কাজ করছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকে পড়ছে। মাদল, এফ মাইনর জাতীয় ব্যান্ড দল হয়েছে তরুণদের। তারা যে কঠিন অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সংকটের মধ্যেও গানের দল গঠন করেছে, এটিই তো প্রেরণার ও আনন্দের।

৩.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ প্রবন্ধে লিখেছেন, 'আজ তোমাদের তারুণ্যের মধ্যে আমার অবারিত প্রবেশাধিকার নাই, তোমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা আদর্শ যে কী, তাহা স্পষ্টরূপে অনুভব করা আজ আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু, নিজেদের নবীন কৈশোরের স্মৃতিটুকুও তো ভস্মাবৃত অগ্নিকণার মতো পক্ককেশের নীচে এখনো প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে- সেই স্মৃতির বলে ইহা নিশ্চয় জানিতেছি যে, মহৎ আকাঙ্ক্ষার রাগিণী মনের যে তারে সহজে বাজিয়া উঠে তোমাদের অন্তরে সেই সূক্ষ্ম সেই তীক্ষ্ণ সেই প্রভাত সূর্য রশ্মি নির্মিত তন্তর ন্যায় উজ্জ্বল তন্ত্রীগুলিতে এখনো অব্যবহারে মরিচা পড়িয়া যায় নাই - উদার উদ্দেশ্যের প্রতি নির্বিচারে আত্মবিসর্জন করিবার দিকে মানুষের মনের যে একটা স্বাভাবিক ও সুগভীর প্রেরণা আছে তোমাদের অন্তঃকরণে এখনো তাহা ক্ষুদ্র বাধার দ্বারা বারংবার প্রতিহত হইয়া নিস্তেজ হয় নাই। ...আমি জানি, নিজের ব্যবসায়ের সংকীর্ণতা ও স্বার্থসাধনের চেষ্টা তোমাদের সমস্ত মনকে গ্রাস করে নাই; ...আমি আজ তোমাদের সারস্বতবর্গের নামে আহ্বান করিতেছি- ভোগের পথে নহে, ভিক্ষার পথে নহে, কর্মের পথে। সকালবেলায় যদি ঘন কুয়াশা হইয়া থাকে তবে অধীর হইয়া ফল নাই এবং হতাশ হইবারও প্রয়োজন দেখি না - সূর্য সে কুয়াশা ভেদ করিবেই এবং করিবামাত্র সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে।...এখন বাজাও তোমার শঙ্খ, জ্বালো তোমার প্রদীপ..। বৈশাখ ১৩১২।'

আমি জানি, আদিবাসী তরুণদের অনেক মেধা আছে, সুন্দর মন আছে, শক্তি ও সাহস আছে। নিজের, পরিবারের, আদিবাসী সমাজের, দেশের ও পৃথিবীর জন্য ভালোবাসা ও চিন্তা আছে। এই পৃথিবীর অনেক অন্ধকার, মন্দ ও খারাপ বিষয়গুলো তাদের এখনও স্পর্শ করতে পারেনি। বাঙালিদের ও বড়দের পরশ্রীকাতরতা জাতীয় সমস্যা ওদের স্পর্শ করতে পারেনি। আমি মনে করি, 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' অথবা 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' জাতীয় কুৎসিত প্রবাদ তরুণ আদিবাসীরা বিশ্বাস করে না। আমার গারো আচিক ভাষায় এই ধরনের কোনো প্রবাদ-প্রবচন নেই। জানি না পাহাড়ে চাকমা, মারমা বা ত্রিপুরা ভাষায় আছে কিনা এমন স্বার্থপর প্রবাদ।

পাহাড়ি তরুণদের মনে রাখা দরকার, বহুদূর, অনেকদূর যেতে হবে। দূর্গম দূর পাহাড়ের পথ পাড়ি দেবার উপযুক্ত মানুষ হতে হবে। তাই এখনি এই পথচলার জন্য তৈরি হওয়া দরকার। যাত্রা শুরু হোক এখনি। 'গন্তব্যে পৌঁছার চেয়ে যাত্রাপথ অনেক সুন্দর'- কথাটি মনে রাখতে হবে। কথাটি লেখা আছে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ফেরা উপন্যাসে। তরুণরা হয়তো পরিবর্তন চায়। কে পরিবর্তন আনবে? তরুণদেরকেই তো কাজটি করতে হবে। তাকে You are the agent of change কথাটি মনে রাখতে হবে। এ জন্য সৎ আদর্শ বজায় রেখে, দৃঢ় ও অটুট রেখে প্রচুর পড়াশোনা করতে হবে, বই পড়তে হবে। জ্ঞানার্জন করতে হবে। যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। আমার বাবার মুখস্ত ছিল, আর বলতেন, 'পারিব না এ কথাটি বলিও না আর, একবার না পারিলে দেখ শতবার।' ছেলেবেলা রাতে ঘুমানোর সময় বাবা কবিতাটি উচ্চারণ করতেন।

৪.

বই হলো সবচেয়ে ভালো বন্ধু। ধার করে হলেও বই পড়তে হবে। সময় নষ্ট করা যাবে না। আমরা পড়েছি, সময় ও স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না। Time and tide wait for none. আর নিজের খুব ভালো বন্ধু থাকতে হবে। ভালো বন্ধুর সংখ্যা অনেক অথবা একাধিক হলে ভালো হয়। সৎ বন্ধু পাওয়া সহজ নয়, তবে পাওয়া সম্ভব, খুঁজতে হবে। পথ চলতে চলতে বন্ধু পাওয়া সম্ভব। মন খারাপ হলে বন্ধুর কাছে সব কথা খুলে বলতে হবে। হতাশ হয়ে মন খারাপ করে বসে থাকা যাবে না। 'বন্ধু তোমার পথের সাথীকে চিনে নিও' গানটি শোনা যেতে পারে। অথবা কোলকাতা ইয়থ ক্যয়ারের 'হতাশায় থামা নয় আর না, আর নয় বুক ভাঙা কান্না, পথে যদি বাধা থাকে থাক না, আলো যদি নিভে যায় যাক না, তবু আর থামা নয় আর না' গানটি গুণগুণ করে গাওয়া যেতে পারে। আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমরা সমবেত কণ্ঠে গানটি গাইতাম।

এখন কঠিন এক সময়। পাহাড়ি তরুণরা এ কঠিন সময়েও নিজে যেন অসম্ভব সৎ থাকার চেষ্টা করে। মানবিক আদর্শিক গুণাবলী অর্জনের ও তা বাস্তবায়নের চেষ্টা তাদের থাকতে হবে। আমরা পড়তাম, Honesty is the best policy. অন্যরা যে যাই বলুক, নিজের কাছে সৎ থাকতে হবে। তাদের ভালো ছাত্র-ছাত্রী হতে হবে। ক্লাশের পড়াশোনায় খারাপ করা

গ্রহণযোগ্য নয়। যে ক্লাশের পড়াশোনায় ভালো নয়, তার পক্ষে নেতৃত্ব দেয়া সহজ নয়। যদিও এর ব্যতিক্রম আছে, তবে বেশি নয়। নিজের সমাজ, আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতিকে ভালোবাসতে হবে, শ্রদ্ধা করতে হবে। সমাজের অগ্রজদের যথাযথ সম্মান করতে হবে। মানুষকে ভালোবাসবার গুণ থাকতে হবে। বলো কী তোমার ক্ষতি, জীবনের অথৈ নদী, পার হয় তোমাকে ধরে, দুর্বল মানুষ যদি... প্রশ্নের উত্তর নিজের হৃদয় দিয়ে খোঁজার চেষ্টা করতে হবে। ভালো নেতার সবচেয়ে ভালো গুণ হলো মানুষের প্রতি ভালোবাসা। আদিবাসী তরুণদের গ্রহণ করবার চেয়ে দান করবার মতো মন থাকতে হবে এবং এ জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। 'সেইসব পায় যেজন বিলায় করে না্ কভূ গ্রহণ'- কথাটির গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করতে হবে। আমি কী পেয়েছি, তার চেয়ে আমি কী দিয়েছি, কথাটি কষ্ট হলেও উপলব্ধিতে আনতে হবে। এরকম ভাবতে পারা সহজ নয়। এ জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে হয়, মহৎ উদার হৃদয় মানুষ হতে হয়। উপরের উদ্ধৃতি মনে রাখলে ভালো হয়। সমাজের কাছ থেকে কী পেয়েছি সেটি বড় কথা নয়, আমি সমাজকে কী দিতে পারি, সেটি বড় কথা।

৫.

আদিবাসী তরুণদের স্বপ্ন দেখার মানুষ হতে হবে। আমরা জানি, আজকের যারা তরুণ, তাদেরকেই আগামী দিনে সমাজে ও দেশে নেতৃত্ব দিতে হবে। সময় নিজেই এ দায়িত্ব তরুণদের হাতে তুলে দেবে। সেই নেতৃত্ব কেমন হবে, এ প্রশ্নটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

মহাশ্বেতা দেবী লিখেছিলেন, 'এক সময়ে বন ছিল, পাহাড় ছিল, নদী ছিল, আমরা ছিলাম। আমাদের গ্রাম ছিল, ঘর ছিল, জমি ছিল, আমরা ছিলাম। আমাদের ক্ষেতে আবাদ হতো ধান, কোদো, কুটকি, সোমা, আমরা ছিলাম। তখন শিকার ছিল। বৃষ্টি হতো, ময়ূর নাচতো, আমরা ছিলাম। মানুষ বেড়ে যেত, সংসার বেড়ে যেত, আমরা কিছু মানুষ চলে যেতাম দূরে। পৃথিবীর কাছে বলে নিতাম ঘর বাঁধতে খুঁটি পুঁতছি, চাষ করবো তাই জমি হাসিল করবো। সেইখানে বেঁধে নিতাম ঘর, গড়ে নিতাম গ্রাম, যে যার মতো জমি হাসিল করতাম। তখন আমরা ছিলাম, শুধু আমরা ছিলাম।' সেই সময় পার হয়ে আজ আমরা একটি আধুনিক সমাজে বাস করছি। আদিবাসীরা এখন অনেকেই শহরমুখি। ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষার দিকে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু আমাদের শিক্ষা যেন আমাদের সমাজ থেকে, মূল শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে না দেয়। আমাদের মূল্যবোধকে যেন আমরা বিসর্জন না দিই।

দক্ষিণ আমেরিকার মানুষের একটি বিশ্বাসের কথা আমি জানি। পৃথিবীতে মানুষের মৃত্যু না হলে বনের পাখি, সমুদ্রের মাছ কোনটার নাকি জন্ম হতো না। একজনের মৃত্যুতে আরেকজনের জন্ম হয়। এভাবেই ঘুরে চলে পৃথিবী। যেমন শিকারী যখন কোনো প্রাণী শিকার করে, তখন বনে শূণ্যতার সৃষ্টি হয়। পরে একদিন শিকারীর মৃত্যুর পর সেখানে আবার কোনো প্রাণীর জন্ম হয়। এভাবে শূন্যতা পূরণ হয়। পাহাড়ের তরুণদের কথাগুলো গভীরভাবে ভাবতে হবে আর দায়িত্ববান হতে হবে। সবার আগে থাকা চাই, মানুষ হওয়ার স্বপ্ন, নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলার স্বপ্ন, যে স্বপ্ন সমাজে কল্যাণ বয়ে আনবে।

৬.

আমি যখন পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লেখা শুরু করি, তখন পাহাড়ের অধিকার নিয়ে অনেক কলাম লিখেছি। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে লিখেছি আজকের কাগজে, ভোরের কাগজে, জনকণ্ঠে ও প্রথম আলো'তে। আমি লিখেছিলাম, এন এন লামরার জীবন গল্পের মতো। তার সংসদের বক্তৃতাগুলো যেন কবিতার মতো শক্তিশালী ও আবেদনময়। একবার লিখেছিলাম, আবার যেন গেংগুলিরা পাহাড়ের জীবনে ফিরে আসে শুধু প্রেম ভালোবাসার পালাগান নিয়ে নয়, সংগ্রামের বিপ্লবের গান নিয়ে, প্রেরণার গান নিয়ে, পাহাড়ি যুবক-যুবতী যেন রাতভর উৎসবে আসতে পারে, আগেকার দিনের মতো নাচতে গাইতে পারে, আনন্দ করতে পারে। পাহাড়ি মায়ের মুখে তার সন্তানকে গল্প বলার দিন যেন ফিরে আসে। আজকের তরুণ বন্ধুদের অবশ্যই এম এন লারমাকে নিয়ে প্রকাশিত বইটি পড়া দরকার, যেখানে তাঁর সংসদীয় বক্তৃতাগুলো সংকলিত আছে।

> ক্ষমা গুণ, শিক্ষা গ্রহণের গুণ ও পরিবর্তিত হওয়ার গুণ– এই তিন গুণের অধিকারী না হলে প্রকৃত বিপ্লবী হওয়া যায় না।
>
> *– মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

জাতিগত নির্মূলীকরণ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা: প্রাসঙ্গিক ভাবনা

শ্রী অমরজিৎ

বাংলাদেশ একটি বহু জাতি, বহু ধর্ম ও বহুমাত্রিক সংস্কৃতির দেশ। এই বদ্বীপ অঞ্চলে বাঙালি ও আদিবাসী বিভিন্ন জাতি স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাস করে আসছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই অঞ্চলে বিভিন্ন আদিবাসী রাজন্যবর্গ শত শত বছর ধরে রাজ্য শাসন করেছে। এই বদ্বীপ অঞ্চলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃক শাসন-শোষণের সুচনাপর্বের পর আদিবাসী জাতিসমূহের ওপর নেমে আসে এক অন্ধকারের যুগ। শুধুমাত্র আদিবাসী জনগোষ্ঠী নয়, ভারতবর্ষের অ-আদিবাসী বিভিন্ন জাতিও দু'শো বছরের বৃটিশ রাজত্বকালে নানা নিপীড়ন, নির্যাতন ও শোষণ-বঞ্চনার শিকার হয়েছিল। অর্থনৈতিক শোষণের কারণে বৃটিশ রাজত্বকালে ১১৭৬ বঙ্গাব্দে (১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে) ভারতবর্ষে বড় ধরনের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল যা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে সমধিক পরিচিত। এই দুর্ভিক্ষে এক কোটি লোক মারা যায় বলে ধারণা করা হয়।

বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৫৭ সালে ভারতবর্ষ দখল করলেও ১৮৬০ সালের পূর্ব পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম বৃটিশের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল না। বৃটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনদণ্ড সরাসরি নেয়ার পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগোষ্ঠীর ওপর বৃটিশ সরকারের শাসন শোষণ শুরু হয়। বৃটিশের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্মলাভ করে। ভারত বিভাজন নীতি অনুসারে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা। কিন্তু বাউন্ডারি কমিশনের এক কলমের খোঁচায় অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হয়। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের করুণ পরিণতির পেছনে বাউন্ডারি কমিশন ও তৎকালীন কংগ্রেসের নেতৃত্ব এর দায় এড়াতে পারে না। এক্ষেত্রে পার্বত্য অঞ্চলের অদূরদর্শী ও স্বার্থপর সামন্ত নেতৃত্বও অনেকাংশে দায়ী বলে বিবেচনা করা যায়।

পাকিস্তান সরকার শুরু থেকে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে। সেসময় পাকিস্তান সরকার ভারত থেকে আসা শত শত মুসলিম পরিবারকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন করেছিল। বৃটিশ আমলে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির বলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের চিরায়ত ভূমি সুরক্ষিত ছিল। পাকিস্তান সরকার জুম্ম জনগণের ভূমির অধিকারকে খর্ব করার লক্ষ্যে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি সংশোধন ও ১৯৫৮ সালে ভূমি অধিগ্রহণ আইন প্রণয়ন করে। একদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির জুম্ম জনগণের অধিকার সংক্রান্ত নানা বিধান সংশোধন, অপরদিকে কর্ণফুলি নদীর ওপর কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণকে নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ ও তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়ার নানা অপকৌশল গ্রহণ করতে থাকে। এই কাপ্তাই বাঁধের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের এক লক্ষাধিক জুম্ম জন্মভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়। তাদের একটি বড় অংশ জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এভাবে জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার লক্ষ্যে পাকিস্তান সরকার পরিকল্পিতভাবে নানা ধ্বংসাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে থাকে।

অপরদিকে বাঙালি জনগোষ্ঠীর ওপরও পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক নানা আগ্রাসন, বঞ্চনা ও নিপীড়ন-নির্যাতন চলতে থাকে। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হলে পূর্ব পাকিস্তানে আগুন জ্বলে উঠে। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে পূর্ব বাংলায় তীব্র সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। ছাত্রসমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে মিছিল ও সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। ছাত্রসমাজের মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। এতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার শহীন হন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ও সর্বশেষ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র জন্মলাভ করে। ভাষা তথা সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে, ব্যবসা-বাণিজ্য তথা অর্থনীতির সকলক্ষেত্রে এবং শিক্ষা, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে সকল প্রকার শোষণ-বঞ্চনার অবসান এবং একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি-আদিবাসীসহ সকল ধর্মের মানুষের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্ম। সুতরাং স্বাধীন বাংলাদেশ নামের সাথে বাঙালি-আদিবাসী সকল জনগোষ্ঠী মানুষের রক্ত মিশে রয়েছে। স্বাধীন বাংলার মাটি শুধুমাত্র বাঙালি জাতির রক্তে পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা লাভ করেনি, তাতে আদিবাসী মানুষের রক্তেরও অবদান রয়েছে। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে এ ভারতবর্ষের সকল

প্রকার ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামে সর্বদা আদিবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অবদান ছিল।

মুক্তিযুদ্ধ চেতনার ভিত্তিতে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। পাকিস্তানি শোষকদের শোষণ-বঞ্চনা ও ভেদ-বৈষম্যের অবসান, অর্থনৈতিক মুক্তি, সর্বোপরি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর জাতিগত শাসন-শোষণ ও নিপীড়ন-নির্যাতন অবসান করে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল মুক্তিযুদ্ধ চেতনার অন্যতম দিক। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক ঘোষিত স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রে উল্লেখ ছিল যে, 'বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করার জন্যেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা।'

সাম্প্রদায়িক ও সামরিক শাসনব্যবস্থার বিপরীতে একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ ও শোষণ-বঞ্চনাহীন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালে এক মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এটা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, স্বাধীনতার পর পরই নবীন সরকার কর্তৃক দেশের সংবিধান রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং তৎকালীন আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনকে প্রধান করে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট এক কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণ পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন খসড়া সংবিধান বিল আকারে পেশ করেন এবং ৪ নভেম্বর তা গণপরিষদে পাশ হয়।

কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য যে, জাতিগত শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হলেও স্বাধীনতার পর স্বাধীন বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধ চেতনার সেই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলেই সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে পারেনি। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি খোলস থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী বেরিয়ে আসতে পারেনি। ফলে দেশের শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় অন্ধ হয়ে জুম্ম জাতিসহ দেশের জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর উপর জাতিগত বৈষম্য ও বঞ্চনা শুরু করে। তার প্রথম বহি:প্রকাশ ঘটে ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান রচনার সময়।

এই সংবিধানে দেশের ৫০টির অধিক আদিবাসী জাতিকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়নি। স্বীকৃতি প্রদান করা হয়নি আদিবাসী জাতিসমূহের প্রথাগত ভূমির অধিকারসহ তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার। উপরন্তু এসব আদিবাসী জাতিসমূহের জাতীয় অস্তিত্ব ও পরিচিতিকে অস্বীকার করে তাদেরকে সংবিধানে 'বাঙালি' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, যা গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী। জুম্ম জনগণের প্রিয় নেতা ও গণপরিষদের সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (এম এন লারমা) সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে সরকারের অগণতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক আচরণ ও আদিবাসী জাতিসমূহকে সংবিধানে স্বীকৃতি প্রদান না করে বাঙালি করার কারণে সংবিধান পাশ করার সময় এর প্রতিবাদস্বরূপ তিনি গণপরিষদের অধিবেশন বর্জন করেন। ১৯৭২ সালের সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল আদিবাসী জাতিসমূহকে বাঙালি হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। স্বাধীনতার অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করা সম্ভব হলেও ১৯৭২ সালের সংবিধানে দেশের বাঙালি ব্যতিত অন্যান্য জাতিসমূহকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান না করায় সত্যিকার অর্থে এই সংবিধান একটি গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক সংবিধান হয়ে উঠতে পারেনি।

সংবিধানে কেবল জাতিগত স্বীকৃতির ব্যত্যয় ঘটেনি, ঘটেছে যুগ যুগ ধরে ঐতিহাসিকভাবে প্রচলিত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার অস্বীকৃতিও। প্রাক-উপনিবেশিক কাল থেকে এমনকি পাকিস্তান শাসনামলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতিসমূহ বিশেষ শাসনব্যবস্থা ভোগ করে আসছিল। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান রচনার সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের সেই শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে যাওয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসন কাঠামো এবং জুম্ম জনগণের স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তা ও বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপটে সংবিধানে সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য মহান নেতা এম এন লারমা সংবিধান প্রণয়ন কমিটির নিকট স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরেন। তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর উগ্র জাতীয়তাবাদী দাম্ভিকতায় জুম্ম জনগণের সকল ন্যায্য দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, যা ছিল মুক্তিযুদ্ধ চেতনার সম্পূর্ণ বিরোধী। জুম্ম জাতির শাসনতান্ত্রিক অধিকারের অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী শাসকগোষ্ঠী স্বয়ং সেদিন মুক্তিযুদ্ধ চেতনার অন্যতম দিক- সকল জাতি, বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ নির্বিশেষে সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার নীতিগত অবস্থানের বিপরীতে সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত বৈষম্যের নীতি গ্রহণ করেছিল।

১৯৭২ সালের সংবিধানে আদিবাসী জাতিসমূহকে বাঙালিতে পরিণত করার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা সারা বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসমূহের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধানে দেশের আদিবাসী জাতিসমূহকে বাঙালিতে পরিণত করার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ

চেতনার মূল স্তম্ভ- 'অসাম্প্রদায়িক' (ধর্মনিরপেক্ষতা) এই চেতনার কবর রচনা করা হল। সে অর্থে মুক্তিযুদ্ধ চেতনার প্রথম স্খলন ঘটে ১৯৭২ সালে। এরপর বিভিন্ন সরকারের আমলেও এর স্খলন পরিলক্ষিত হয়। এই স্খলনের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো- ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বিপরীতে সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধান অনুসারে- দেশের রাষ্ট্রধর্ম হলো- ইসলাম। এভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারের আমলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্খলন হতে থাকে এবং এর ফলে সারাদেশে ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা পরিপুষ্ট লাভ করে, যার সর্বশেষ চিত্র হলো এবারের (২০২১ সাল) দুর্গাপূজার সময়ে সারাদেশের দুর্গাপূজার মণ্ডপ, হিন্দু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও পৌরহিত হত্যা।

পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগোষ্ঠীর ওপর সাম্প্রদায়িক হামলা, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গণহত্যা, ভূমি বেদখল, নারী ধর্ষণ, নানা নিপীড়ন নির্যাতন- এসব কার্যক্রম একইসূত্রে গাঁথা। বাংলাদেশের সর্বত্র সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার ব্যাপক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে- রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা, বিশেষত: সরকার ও প্রশাসন যারা চালায় তাদের অধিকাংশই সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন। যার কারণে দেশের মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী অতি সহজেই সরকার ও তার প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে থাকে। সরকার ও তার প্রশাসনের সামরিক-বেসামরিক আমলার সাম্প্রদায়িক সংখ্যা আধিক্য হবার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণকে জাতিগত নির্মূলীকরণ কার্যক্রম আরো বেশি পরিমাণে জোরদার হয়েছে।

গণহত্যা হলো জাতিগত নিধনের এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। অধ্যাপক মিশায়েল মান, অধ্যাপক ডেরেক এইচ হাভিসের মত সমাজতাত্ত্বিকগণ গণহত্যাকে জাতিগত নিধনের এক অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। পার্বত্য চুক্তি-পূর্ব সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ছোট বড় সর্বমোট ১৫টি গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়। এসব গণহত্যায় শত শত জুম্ম নারী-পুরুষ-শিশু হত্যা করা হয়েছে। শত শত নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। হাজার হাজার একর চিরায়ত ভূমি বেদখল করা হয়েছে। সম্পদ লুন্ঠিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও নানা নিপীড়ন নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং এখনো তা অব্যাহত রয়েছে। জাতি নিধনের এসব কার্যক্রম দিনে দিনে জোরদার করা হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে জাতিগত নিধনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। জাতিগত নিধনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জার্মান চ্যান্সেলার চরম ফ্যাসিবাদী হিটলারের নেতৃত্বে ইহুদী নিধনযজ্ঞ। ১৯৩৩-১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের সময়কালে ফ্যাসিবাদী হিটলালের নেতৃত্বে নাজি বাহিনী কর্তৃক ৬০ লক্ষ ইহুদী হত্যা করা হয় বলে জানা যায়। জাত্যাভিমান এবং কোন রাষ্ট্রে কোন জাতির একক কর্তৃত্ব স্থাপনের চরম আকাঙ্ক্ষা থেকেই এধরনের জাতিগত নিধন বা এথনিক ক্লিনজিং কার্যক্রম সংঘটিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশেও বাঙালি জাতির শাসকগোষ্ঠীর জাত্যাভিমানী চিন্তাধারা এবং রাষ্ট্রে চরমভাবে বাঙালি জাতির একক কর্তৃত্ব স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা সারা বাংলাদেশের জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিমূলীকরণ কর্মসূচী গ্রহণের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতিসমূহের নির্মূলীকরণের নিমিত্তে বাংলাদেশ সরকারের প্রথম পদক্ষেপ হলো- সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো ইত্যাদি জুম্ম জাতিসমূহকে বাঙালি পরিণত করা। ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুসারে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো ইত্যাদি জাতিসমূহ আর স্বতন্ত্র জাতি রইলো না; বরং এসব জাতিসমূহকে বাঙালিতে পরিণত করা হলো। একই বিবেচনায় সমতলের গারো, হাজং, মণিপুরী, খাসি, সাঁওতাল ইত্যাদি জাতিরাও বাঙালি হয়ে গেল। জুম্ম জাতিসমূহকে জাতিগত নির্মূলীকরণের দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো- পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিকায়ন ও সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। স্বাধীনতার পর পর ১৯৭৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনটি ক্যান্টনমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে একটি নৌ ঘাঁটিসহ ৫টি ব্রিগেড ও ৫০০ এর অধিক অস্থায়ী সেনাক্যাম্প স্থাপন করার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রকৃতপক্ষে একটি সেনা ক্যান্টনমেন্টে পরিণত করা হয়। পরবর্তীকালে জাতিগত নির্মূলীকরণের জন্য যাবতীয় কর্মসূচী বাস্তবায়ন সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বে পরিচালনা করা হয়। অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করা, সাম্প্রদায়িক হামলা ও গণহত্যা, ভূমি বেদখলের মধ্য দিয়ে জুম্মদের উচ্ছেদ ও দেশান্তর করা, ধর্মীয় পরিহানি ও ধর্মান্তরকরণ, সম্পদ লুন্ঠন, নারী ধর্ষণ, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও নানা কায়দায় নিপীড়ন-নির্যাতন ইত্যাদি সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সহযোগিতা ও ইন্দনে সংঘটিত হয়েছে।

১৯৭৯-১৯৮৬ সালের মধ্যে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে বহুবার গণহত্যা ও সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়। এ গণহত্যা ও সাম্প্রদায়িক হামলায় শত শত জুম্ম নারী-পুরুষ-শিশুকে হত্যা করা হয়। এসময় বহু জুম্ম নারী ধর্ষণের শিকার হয়। শাসকগোষ্ঠীর এধরনের সংহারমূলক কার্যকলাপের কারণে নিরাপত্তা ও জীবন রক্ষার তাগিদে এসময়ে ৭০ হাজার জুম্মকে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। জুম্মরা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলে সে সুযোগে সেটেলার বাঙালিরা পাহাড়ীদের শত শত

একর জমি ও তাদের বাগান-বাগিচা বেদখল করে নেয়। সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি বেসামরিক আমলারাও পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটেলার পুনর্বাসন, ভূমি বেদখল ইত্যাদি সংহারমূলক কর্মসূচীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগত নির্মূলীকরণের তৃতীয় বৃহত্তম পদক্ষেপ হলো- সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পাঁচ লক্ষাধিক বহিরাগত সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের ভূমিতে বসতি প্রদান। এর লক্ষ্য হলো- একদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগোষ্ঠীকে সংখ্যালঘুত্বে পরিণত করা, অপরদিকে ভূমি বেদখল, সাম্প্রদায়িক হামলা, গণহত্যা ইত্যাদি কাজে মানবঢাল হিসেবে তাদেরকে ব্যবহার করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা দখল করা। বাস্তবেও লক্ষ্য করা গেছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সাম্প্রদায়িক হামলা, গণহত্যা ও ভূমি বেদখলের ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠী সেটেলার বাঙালিদের সফলভাবে ব্যবহার করে চলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যা শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর শেখ হাসিনা সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি’ স্বাক্ষরিত হয়। যে কোন চুক্তি বাস্তবায়নের প্রথম কাজ হলো- চুক্তির আলোকে আইন, বিধি ও প্রবিধি প্রণয়ন করা এবং চুক্তির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনের সংশোধন করা। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পার্বত্য চুক্তি অনুসারে যেসব আইন ও বিধি প্রণয়ন করা এবং বিদ্যমান আইন সংশোধন করার কথা রয়েছে সেসব আইন ও বিধি অদ্যাবধি প্রণয়ন কিংবা সংশোধন করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, পার্বত্য চুক্তি সম্পাদনের ২৪ বছর অতিক্রম হতে চলেছে, কিন্তু সরকার আজ অবধি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের বিধিমালা প্রণয়ন করেনি। পুলিশ আইন, ইউনিয়ন পরিষদ আইন, পৌরসভা আইন, উপজেলা পরিষদ আইন, পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি (১৯০০ এ্যাক্ট রেগুলেশন), বন আইন ইত্যাদি সংশোধন করেনি। এসব আইন সংশোধন না হলে চুক্তির আলোকে গঠিত আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ কার্যকর হতে পারে না। তাছাড়া আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট আইন অনুসারে সকল বিষয়, বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান অদ্যাবধি হস্তান্তর করা হয়নি। আইন-শৃংখলা, পুলিশ, ভূমি ও বন-পরিবেশ-এর মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও প্রতিষ্ঠান হস্তান্তর করা হয়নি। পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট বেশ কিছু বিষয় হস্তান্তর করা হলেও অধিকাংশ বিষয় হস্তান্তর করা হয়নি। পার্বত্য চুক্তি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামে বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করার কথা। কিন্তু সরকার পার্বত্য চুক্তি অনুসারে অস্থায়ী সেনাক্যাম্প ও অপারেশন উত্তরণ প্রত্যাহার করা হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের, বিশেষ করে জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, আইন-শৃঙ্খলা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিলেও সরকার সেসব অধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়েছে। এর পেছনে অন্যতম মূল কারণ ছিল সরকার মুক্তিযুদ্ধ চেতনা থেকে দূরে সরে যাওয়া। উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে আসতে না পারার কারণেই শাসকশ্রেণি পার্বত্য চুক্তিতে স্বীকৃত পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে পারেনি। ফলে মুক্তিযুদ্ধ চেতনার আলোকে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবর্তে শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী নীতি-কৌশল গ্রহণ করেছে বলে নি:সন্দেহে বলা যেতে পারে।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন না করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতিসমূহকে নিমূলীকরণ কার্যক্রম জোরদার করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজে ও তাঁর সরকার জুম্ম জনগণের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। পার্বত্য চুক্তির যথাযথ ও সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন, দেশের আদিবাসীদের ‘আদিবাসী’ হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবেন এটাই আজ জুম্ম জনগণসহ দেশের বাঙালি-আদিবাসী সকলেরই একমাত্র প্রত্যাশা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম, আদিবাসী আন্দোলন এবং এম এন লারমা: নিজস্ব অভিজ্ঞতার বয়ান

মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম

বাংলাদেশের মানুষ পার্বত্য চট্টগ্রামকে চেনেন ওখানকার নৈসর্গিক দৃশ্য ও রূপের কারণে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ শীত ও গ্রীষ্মকালীন অবসর যাপন কিংবা ভ্রমণের জন্য বান্দরবানের স্বর্ণমন্দির, চিম্বুক পাহাড়, শৈলপ্রপাত, নীলগিরি, নীলাচল; খাগড়াছড়ির পানছড়ি, মাইনী ও চেঙ্গি উপত্যকা, আলুটিলা পাহাড় ও গুহা, রিছাং ঝর্ণা, বিভিন্ন বৌদ্ধ মন্দির, রাঙ্গামাটির ঝুলন্ত ব্রিজ, শুভলং ঝর্ণা, বন বিহার, চাকমা রাজার বাড়ি, কাপ্তাই লেইক যান।

পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাই লেইকের ছলাৎ ছলাৎ জল সাধারণ বাঙালিকে মুগ্ধ করে। কিন্তু এই কাপ্তাই লেইক পাকিস্তান আমল থেকেই যে আদিবাসী জাতি জনগোষ্ঠীর মানুষের কাছে বেদনার্ত চোখের জল তা বাঙালিই জানেনা। সমতলের বাঙালির জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ড্যাম-ব্যারেজ নির্মাণ করতে গিয়ে এই কাপ্তাই লেইকের কারণে যে ৪০-৫০টি গ্রাম ডুবে গিয়েছিল, লাখো মানুষ যে বসত-ভিটাহীন উদ্বাস্তুতে রূপান্তরিত হয়েছিল তা বেশির ভাগ বাঙালিরই জানার সুযোগ নেই।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শ্রেণি থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যবই কিংবা ইতিহাসের বইগুলোতে আদিবাসীদের সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও জুমচাষ ভিত্তিক জীবন, প্রান্তিক সংস্কৃতি, পাহাড়ি ও শান্তিবাহিনী সম্পর্কে যা লেখা হয়ে থাকে বা শিক্ষা দান করা হয় তাতে প্রচলিত ও আধিপত্যবাদী ডিসকোর্সের বাইরে ভিন্নতর কোনও ডিসকোর্স, দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠার নুন্যতম সুযোগ নেই। বাংলাদেশের উগ্রবাদী বাঙালি জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে আদিবাসী সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তারা যা লেখেন, এর বাইরে সাধারণ মানুষের বের হওয়া সাধারণভাবে প্রায় দুরূহ এবং অসম্ভব ব্যাপার। যদিও বাস্তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে নিয়ে বাঙালি লেখকদের বাইরে আদিবাসী লেখক, আদিবাসী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত পোষণকারী মানুষজনও অনেক কিছু লিখেছেন বা লিখে চলেছেন।

তবে এসবের বেশির ভাগ বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠীর কাছে যাওয়ার সুযোগ নেই। এসব লেখা প্রান্তিক অবস্থানে থাকলেও এরমধ্যে বহু বিস্তৃত বিষয়বস্তু আছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম, আদিবাসী আন্দোলন ও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে নিয়ে বহু লেন্স থেকে দেখা কিংবা লেখার সুযোগ থাকলেও আমি বর্তমান প্রবন্ধে শুধু এই বিষয়ে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার অনুপুঙ্খ বয়ান তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। লেখাটিতে আমার গড়ে উঠার সময়কালের সমান্তরালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যু, আদিবাসী আন্দোলন ও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সম্পর্কে পাঠ, শিক্ষা গ্রহণ ও পাঠদানের সময়ে কীভাবে আমি বিষয়টি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠি সেসব বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবো।

সিলেটের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষে থাকার সময়ে সিলেটের ‘বইপত্র’ নামে একটি বইয়ের দোকানে হুমায়ুন আজাদের বই খুঁজছি। আরজ আলী মাতুব্বর, তসলিমা নাসরীন, প্রবীর ঘোষ থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রথা বিরোধী লেখকের মতো নিয়মিতই হুমায়ুন আজাদের বই পড়ি, পড়তে ভালোলাগে। একধরনের ঘোর কাজ করে। হুমায়ুন আজাদের প্রবন্ধ, উপন্যাস, কলাম, সাক্ষাৎকার সংকলন, শিশু সাহিত্যের বই নিয়মিত পড়ি, খুঁজে বেড়াই। তো বইপত্রের একটি তাকে হুমায়ুন আজাদ লিখিত ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম: সবুজ পাহাড়ের ভিতর দিয়ে বয়ে চলে হিংসার ঝর্নাধারা’ বইটি চোখে পড়ে। ছোট্ট কিন্তু চমৎকার একটি নাম। আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে, হুমায়ুন আজাদের বই এবং চমৎকার ও ব্যতিক্রমধর্মী নামের কারণেই বইটি আমার প্রিয় হয়ে উঠে। কী পড়েছিলাম বিস্তারিত মনে নেই। কিন্তু সেই বই লেখা দুটি নাম আমাকে মুগ্ধ করেছিল। একজন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, যিনি আদিবাসী আন্দোলনের নায়ক এবং আরেকজন তখনকার সময়ে অন্যতম পরিচিত কিন্তু বাঙালিদের কাছে পরিচিত কিন্তু খানিকটা রাষ্ট্রের দৃষ্টিকোণ থেকে পাহাড়ে অশান্তি সৃষ্টিকারী রাষ্ট্র বিরোধী চক্রান্তে জড়িত ও বিতর্কিত জ্যেতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা। সন্তু লারমাকে অবশ্য আগেই চেনা ছিল। তিনি ১৯৯৭ সালে শান্তিচুক্তির আগে কিংবা পরে বাংলাদেশের সংবাদপত্র, টেলিভিশন মিডিয়াতে নিয়মিত খবরের অংশ ছিলেন। এবং আমরা যারা গ্রামে বড় হয়েছি তারাও প্রধানত ছোটবেলা থেকেই বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) এর সংবাদে প্রায় প্রতিদিনই পাহাড়ি নেতা বলে ‘সন্তু লারমা’ এর নাম শুনতাম। তো ওই বইয়ের আরকিছু মনে নেই। শুধু মনে আছে তিনি সেখানে আদিবাসী ইস্যু নিয়ে একটা মোটামুটি দীর্ঘ একটি আলোচনা করেছিলেন।

বামপন্থী রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকার কারণে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) এর একটি পুস্তিকা আমার কাছে

আসে। তা হলো কমরেড খালেকুজ্জামান এর 'পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গে'। আমার যতটুকু মনে আছে, ওই বইয়ে তিনি মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে আদিবাসী ইস্যুকে কীভাবে দেখা হয় তা তুলে ধরেছিলেন। এখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুটিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা হয়েছিলো। ধারাবাহিকভাবে সংকটের সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির সমান্তরালে বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রসঙ্গ কিংবা বলতে পারি সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের কথা সামনে এনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো স্বাধীনতার প্রসঙ্গটি সম্ভবত তিনি এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

যদিও স্বশাসন কিংবা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটিকে ইতিবাচকভাবে দেখেছিলেন। তবে এই দেখার মধ্যে শ্রেণি প্রশ্নটিই প্রচুরভাবে এসেছিলো এবং এখানে একটি বিষয় বারবারই জোর দেয়া হচ্ছিল যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম কিংবা কাশ্মীর যদি স্বাধীন ভূখণ্ড হয় তবে সেখানে সাম্রাজ্যবাদী নীল নকশা কিংবা ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করতে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী কিংবা ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর আরো সুবিধা হবে। এর বেশি কিছু মনে নেই। ছাত্র জীবনে ওইটুকুই আমার প্রত্যক্ষভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পরোক্ষভাবে এম এন লারমা সম্পর্কে জানা। তবে এটা ঠিক যে, শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের জন্য সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণের রাজনীতিই পরবর্তীতে বিভিন্ন বিষয়ে দেখার চোখ তৈরি করে দিয়েছিলো। মানব মুক্তির সামগ্রিক সংগ্রামের পাশাপাশি বিশেষ শ্রেণি, গ্রুপ বা সংস্কৃতির মুক্তির প্রশ্নটিও মনে হয় তখন থেকেই বুঝতে শিখেছিলাম।

যাহোক, আমার ছাত্রত্ব শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আমি আমার শিক্ষক খায়রুল ইসলাম চৌধুরীর সাথে পিএইচডি গবেষণার সহযোগী হিসেবে কাজ করতে শুরু করি। সেটা ২০০৭ কিংবা ২০০৮ সালের কথা। সেখানে থাকাকালীন আমি নতুন করে আবিষ্কার করতে শিখি পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যু নিয়ে স্থানীয় আদিবাসী লেখকদের এত লেখালেখি কিংবা ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে পাকিস্তান আমল এমনকি বাংলাদেশ আমলে সরকারগুলোর আদিবাসী ইস্যু নিয়ে এত পরিকল্পনা, নীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে আমার জানা ছিলোনা। আমরা সাধারণ বাঙালিরা তখনও বাস্তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের 'উপজাতীয়' মানুষজনকে মোটামুটি পিছিয়ে পড়া, সাধারণ জীবনে অভ্যস্ত কিন্তু খানিকটা 'অশিক্ষিত' বলেই জানতাম। যেমনটি ব্রিটিশরা আমাদের সম্পর্কে করতেন। প্রাচীন, আদিম কিংবা বর্বর হিসেবে চিহ্নিত করার মানসিকতা। 'উপজাতীয়' শব্দটি ব্যবহার করলাম এজন্যই যে, আসলে তখনো আদিবাসী শব্দটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতাম না। এই শব্দের মাঝে কী ছিল তা জানা ছিল না। যাহোক, পিএইচডি গবেষণার জন্য বইপত্র, সরকারি রিপোর্ট, বিভিন্ন সংবাদ নিউজ, আদিবাসী বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের রিপোট থেকে শুরু করে এমন কিছু ছিল না, যা স্যারের কাছে নেই! বাস্তবে স্যারের কাছে থাকা বইপত্র দেখে মনে হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আদিবাসী বিষয়ে 'ট্রেজার আইল্যান্ড'। আসলে স্যারের সাথে কাজ না করলে আমি কখনোই হয়তো বুঝতে শিখতাম না বা উপলব্ধি করতে পারতাম না যে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আদিবাসী ইস্যু এত গুরুত্বপূর্ণ একটা রাজনৈতিক ইস্যু।

স্যারের কাছে ব্রিটিশ আমল থেকে প্রকাশিত আদিবাসী বিষয়ক সরকারি আইন, নীতিমালা এবং বিধিসমূহ বিশেষ করে '১৯০০ সালের আইন' '১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন' এর কপি থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলসহ যত আইন ছিল, তার একটি করে কপি ছিল। ব্রিটিশ লেখক উইলিয়াম হান্টার, টি এইচ ল্যুইনসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে পাশ্চাত্যের লেখক পিয়েরে বেসাইন, ওলফগ্যাং মেসহ নাম না জানা অনেক লেখকের বই আমার মনোযোগ কেড়েছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেশে আদিবাসী জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিয়ে যত আদিবাসী আন্দোলন হয়েছে তার একাডেমিক ও তাত্ত্বিক বইসমূহের পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি আমলের চিত্র বিভিন্ন রিপোর্ট, বিদেশি সংস্থা বিশেষ করে বিশ্বব্যাংক, এডিবি, আইইউসিএন-এর পলিসি রিপোর্ট। আদিবাসী বিষয়ে পাকিস্তান, বাংলাদেশ আমলে পত্রপত্রিকায়, সেমিনার ও কনফারেন্সে প্রকাশিত ও পঠিত প্রবন্ধ এবং বইয়ের কপি। আমার মনে আছে ১৯৮০ কি ১৯৮১ সালে সাপ্তাহিক 'রোববার' এবং 'নিউ নেশন' পত্রিকায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি নিয়ে ধারাবাহিক রিপোর্ট, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নিয়ে কানাডার ন্যাশনাল লাইব্রেরি আর্কাইভ থেকে সংগৃহিত রিপোর্ট, আদিবাসী সমস্যা নিয়েই উজিসি কর্তৃক প্রকাশিত মনোগ্রাফ রিপোর্ট, সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিজের প্রকাশিত আদিবাসী বিষয়ক জার্নাল ও লেখালেখি, ১৯২০ সালে ব্রিটিশদের বনাঞ্চল নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এডিথকা ওয়ান রিপোর্টের মতো দুর্লভ ও হারিয়ে যাওয়া অনেক বিষয়।

স্যারের বইয়ের মধ্যে থেকেই আমি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, সন্তু লারমা, জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, রাজা দেবাশীষ রায়, মঙ্গল কুমার চাকমা, প্রশান্ত ত্রিপুরা সহ আদিবাসী বিষয়ে অনেক লেখক কিংবা আদিবাসী আন্দোলনের নেতাদেরকে চিনি। 'মাওরুম', 'জুম', 'সলিডারিটি' এবং 'উসুই' নামে বিভিন্ন আদিবাসী বিষয়ক পত্রপত্রিকা কিংবা সংগঠন থাকতে পারে তা আমার কখনো জানাই ছিল না! বাস্তবে সাধারণ বাঙালি জাতি, জনগোষ্ঠীর মানুষজনের যে আদিবাসী বিষয়ক ধারণা তা আমার ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিলো।

সত্যি বলতে আদিবাসীদের নিয়ে কিংবা বলতে পারি আদিবাসী নেতৃত্ব, গবেষক এবং এ্যাকটিভিস্ট যে এত লেখালেখি করেন তা আমি ধারণাও করতে পারিনি। তবে সেসময়ে ও সাধারণভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যু এবং আদিবাসী আন্দোলন সম্পর্কে আমার যতটুকু ধারণা ছিলো মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সম্পর্কে খুববেশি গভীরভাবে জানা ছিল না। আমার যতটুকু মনে হয়, আদিবাসী ইস্যু নিয়ে যত লেখালেখি আছে সরাসরি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নিয়ে এত লেখালেখি হয়নি। আর এম এন লারমাও সরাসরি কিছু লিখেছেন কিনা আমার জানা নাই। আমার পড়া হয়নি। অথবা আদৌ আছে কিনা জানা ছিলোনা। যাহোক, স্যারের সাথে কাজ করতে গিয়ে সেই সময়ে আমার আদিবাসী বিষয়ক ধারণা এবং অভিজ্ঞতা একেবারে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিলো। ওই সময়ে আমি প্রথম বুঝতে শিখেছিলাম আদিবাসী জাতি, জনগোষ্ঠীর মানুষজন ভিনগ্রহের মানুষ নয় বরং সেটেলার বাঙালি ও তাদের সরকার কর্তৃক নিপীড়িত অধিকারহীন একটি 'জাতি'। যাদেরকে সরকার কখনোই স্বতন্ত্র জাতি বলে স্বীকার না করে বরং তাদের বিভিন্ন নেতিবাচক প্রত্যয় (derogatory term) ব্যবহার করে 'উপজাতি', 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী', 'ট্রাইবাল' বলে চিহ্নিত করতে চান।

আসলে ওই সময় থেকেই আদিবাসী বিষয় সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করি। প্রতিবছর আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস, পার্বত্য শান্তিচুক্তির বার্ষিকী, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জন্ম কিংবা মৃত্যুবার্ষিকী সম্পর্কে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, আলোচনা ও সেমিনারের সংবাদ হলে খোঁজ রাখার চেষ্টা করি। আদিবাসী ইস্যু নিয়ে নৃবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন লেখা নিয়ে বিশ্লেষণার্থক প্রবন্ধগুলো পাঠ করতে চেষ্টা করি। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা জীবনের প্রথম থেকেই দেখেছি আদিবাসী ছাত্রছাত্রীরা আদিবাসী দিবসে র‍্যালি, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের চেষ্টা করেন। আদিবাসীদের প্রতি স্নেহ ও মানসিক সহযোগিতার কারণে অনেক সময়েই অন্যান্যদের মতো আমাকেও ডাকেন তাদের অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য। আমি যাই, উৎসাহ দেয়ার চেষ্টা করি। ছাত্রজীবন থেকেই শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষের মুক্তির রাজনীতি তথা সাম্যভিত্তিক সমাজ রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলাম বলে সবসময়ই সমাজের প্রান্তিক অবস্থানে থাকা মানুষ বিশেষ করে নারী, ধর্মীয় মাইনরিটির মানুষজন এবং আদিবাসী জাতিসত্তার মানুষজনের প্রতি এক ধরনের বিশেষ দায়বদ্ধতা সবসময়ই কাজ করে। যার কারণে আমার বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের আদিবাসী ছাত্রছাত্রীরা যাতে বিভাগের অনুষ্ঠান কিংবা সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল একাডেমিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমগুলোতে প্রতিনিধিত্বশীল ভূমিকা পালন করতে পারেন সে চেষ্টা কিংবা কার্যক্রমের অংশ হিসেবেই তাদেরকে আপন করে নেয়ার চেষ্টা। আসলে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের আদিবাসী দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ে তাদের সাথে মিথস্ক্রিয়া, আড্ডা কিংবা তাদের অনুষ্ঠানে বক্তা হিসেবে থাকার কারণে আদিবাসী ইস্যু, আদিবাসী/উপজাতি/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্পর্কিত বিতর্কগুলো নিয়ে রাষ্ট্রের দৃষ্টিকোণ এবং বিরোধিতার সংস্কৃতিকে পাঠ করার চেষ্টা করি। সেসব আলোচনা ও পাঠ থেকেই আদিবাসী বিষয়ে আমার পূর্ণাঙ্গ একটি ধারণা তৈরি হয়েছে। আদিবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা বিষয়ে পাঠ করার কারণে এসব বিষয়ে আমি ক্রমশই আলোকিত এবং হৃদ্য হই। তাদের সম্পর্কে চেতনাগতভাবে একটা স্পষ্ট অবস্থান তৈরি হতে শুরু করে।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে শিক্ষকতা করতে গিয়ে 'অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ' নামে একটি কোর্স পড়ানোর দায়িত্ব পাই। সেই কোর্সে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেশে স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসন তথা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, আদিবাসী আন্দোলন করতে গিয়ে গেরিলা, সন্ত্রাসবাদী ও অনেক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতাবাদী যুদ্ধগুলোর ইতিহাস পড়ানো হয়। যদিও এগুলো বেশির ভাগই মুক্তির আন্দোলন কিন্তু পাশ্চাত্যের লেখকদের রচিত বইপত্রের বেশির ভাগই এসব আন্দোলন সংগ্রামকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা থাকে। বিশেষ করে রুয়ান্ডায় হুটু-টুটসি, ইরাকে সুন্নি-কুর্দি, আয়ারল্যান্ডে ক্যাথলিক ও প্রটেসট্যান্ট, স্পেনে স্প্যানিয়ার্ড ও বাস্ক, শ্রীলঙ্কায় সিংহলিজ-তামিলদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধগুলো অনেকটাই পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সাথে মিলে যায়।

বাস্তবে ওইসব দেশে গেরিলা কিংবা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত যোদ্ধাদের রাজনৈতিক দর্শন ও কার্যক্রম অনেক ক্ষেত্রেই মার্কসবাদী মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিলো এবং আছে। অন্যান্য দেশের আদিবাসী আন্দোলনের মতো মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে শুরু হওয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জুম্ম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও মার্কসবাদী সমাজ দৃষ্টিভঙ্গি ও শ্রেণি প্রশ্ন থেকে শুরু হয়েছিলো।

শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করতে গিয়েই আমি শিখেছি, এগারোটি আলাদা এবং ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি ও জাতিসত্তাকে একত্রিত করে 'জুম্ম জাতীয়তাবাদ' নাম দিয়ে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি শুরু হয়েছে এবং যে আন্দোলন এখনো চলমান তা বিশ্বের যেকোনও জাতীয়তাবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সামগ্রিক মুক্তির আন্দোলনের অবশ্য ইউনিক এবং ব্যতিক্রম। একইভাবে প্রথমবর্ষে 'বাংলাদেশ স্টাডিজ: হিস্টোরি, সোসাইটি অ্যান্ড কালচার' শীর্ষক কোর্স পড়াতে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যু ও আদিবাসী ইতিহাস সম্পর্কে আমি আরো অনেক বেশি কৌতুহলী হয়ে উঠি। বাঙালি জাতীয়তাবাদের

আধিপত্যবাদী যে প্রচলিত ইতিহাসের ডিসকোর্সটি আছে সেখানে আদিবাসী ইস্যু সাধারণত পড়ানোই হয় না। আমার কাছে মনে হয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাস পাঠদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রান্তিক জাতি জনগোষ্ঠীর ইতিহাস পড়ানো উচিত। এক্ষেত্রে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার সাথে জড়িত লেখকরা বিশেষকরে রনজিৎ গুহ, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দীপেশ চক্রবর্তী, গৌতম ভদ্রদের লেখালেখি আমাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিলো।

সেই জন্যই বাংলাদেশেরই ইতিহাস ও সংস্কৃতি কোর্সের সিলেবাস তৈরির ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক, আমার গুরু প্রফেসর খায়রুল চৌধুরীর সহযোগিতায় সেখানে শ্রমিক-কৃষক, নারী, মুক্তিযুদ্ধ, দলিত এবং আদিবাসী আন্দোলন বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামেরই ইতিহাসকে যুক্ত করি এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশের ইতিহাস ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গবেষক উইলিয়াম ভ্যান স্যান্ডাল-এর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে অত্যন্ত উচুঁদরের লেখাগুলোসহ বিশেষ করে 'বেঙলিজ, বাংলাদেশিস, অ্যান্ডআদারস: চাকমা ভিশন অব এ পুরালিস্ট বাংলাদেশ' শীর্ষক লেখাটি আদিবাসী বিষয়ে আমাকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে সহযোগিতা করেছে। বিশেষ করে বাঙালি ও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের সংকটকে চিহ্নিত করতে চাকমাদের বহুত্ববাদী জাতীয়তাবাদ কিভাবে সহযোগিতা করতে পারে তা আমার আদিবাসী ইস্যু সম্পর্কে নতুন করে চোখ খুলে দিয়েছিলো। আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সাথে যুক্ত থাকার কারণে ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যু ও সামগ্রিকভাবে আদিবাসী আন্দোলন সংগ্রাম সম্পর্কে সত্যিকারভাবে জানা সম্ভব হয়েছে বলে আমার মূল্যায়ন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত ও প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তিত্ব মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বিষয়ক লেখালেখির মধ্যে বেশির ভাগই অন্যদের লেখা কিংবা সম্পাদনা। গণপরিষদে সক্রিয় বক্তব্য ছাড়া আমি সরাসরি এম এন লারমার নিজস্ব কোন বক্তব্য বা লেখা পাইনি। তবে এম এন লারমা সম্পর্কে আদিবাসী আন্দোলনের নেতা-কর্মী, শুভাকাঙ্খী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহযোগীদের হাতে এইসব লেখার অনেক কিছুই ইন্টারনেটেও পাওয়া যায়। তবে সেসব লেখার বেশির ভাগই বিভিন্ন সময়ে এম এন লারমার জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রোগ্রামে দেওয়া বক্তব্য। যদিও এসব লেখার মধ্যে বহু বিচিত্র বিষয়সূচি আছে। তবে মঙ্গল কুমার চাকমা সম্পাদিত স্মারকগ্রন্থটি সামগ্রিকভাবে এম এন লারমার রাজনৈতিক দর্শন ও বৈচিত্র্যময় রাজনৈতিক কার্যক্রমকে বুঝতে একটি অনন্য ও অসাধারণ গ্রন্থ। বিশেষ করে ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৪-৭৫ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে গণপরিষদে দেওয়া বক্তব্যে, ভাষণ ও যুক্তি-তর্কগুলো এম এন লারমাকে বোঝার জন্য অসাধারণ একটি দলিল ও সংকলন।

শুধু এই অংশটি দিয়েই পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে আদিবাসী আন্দোলনের মূল বক্তব্য; এম এন লারমার রাজনৈতিক দর্শন ও মতাদর্শিক সংগ্রাম সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা সম্ভব। যদিও ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে সক্রিয়ভাবে গেরিলা আন্দোলনে চলে যাওয়ার পরের সময়ে কার্যক্রম সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায় না তবুও সেই সময়ের লারমার সহযোগীদের বক্তব্য থেকেই অনেক কিছুই উঠে আসে এই স্মারকগ্রন্থে। স্মারকগ্রন্থে স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্যগুলোতে এম এন লারমা সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে অনেক কিছুই জানা যায়। তাই এই স্মারক গ্রন্থটির মধ্যে থাকা বিভিন্ন আলোচনা ও গণপরিষদের ভাষণগুলোকে আমার লেখার মূল ফোকাস বলে চিহ্নিত করবো। এই বই থেকেই আমি জানতে পারি যে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় কলেজে পড়ার সময়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সাথে যুক্ত থেকে। ছাত্র জীবন থেকেই শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী মানুষের মুক্তির জন্য তিনি কাজ করতে থাকেন। বৃটিশ ও পাকিস্তান আমল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ের জাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ রাষ্ট্রের বিভিন্ন উন্নয়নের বলি। তারা বিভিন্নভাবে জাতিগত নিপীড়নের শিকার। পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১টি জুম চাষ কেন্দ্রিক জাতি জনগোষ্ঠীর মানুষজন অধিকারহীন অবস্থায় বেঁচে আছেন। তাদের পরিচয়ের স্বীকৃতি, মানুষ হিসেবে স্বীকৃতির জন্য তিনি আজীবন লড়াই সংগ্রাম করে গেছেন। প্রচলিত অর্থে বেশির ভাগ গণপরিষদের সদস্যরা যেভাবে আরাম আয়েস, বিলাসী জীবনের সাথে যুক্ত হয়ে নিজের জাতি জনগোষ্ঠীর স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষাকে বাদ দিয়ে বাস্তবে আয়েসি ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে সেখানে এম এন লারমা আজীবন সংগ্রামী জীবন কাটিয়েছেন। গণপরিষদের প্রত্যেকটি অধিবেশনে আদিবাসীদের পরিচয়, শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের শিক্ষা, উন্নয়ন তথা সামগ্রিক মুক্তির জন্য তিনি কাজ করে গেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের গণপরিষদে প্রবল ও আধিপত্যবাদী আওয়ামীলীগের সাংসদ, স্পিকারের বিরোধিতার মধ্যেও একাকি সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি এই সংগ্রামে কখনো কখনো হয়তো অন্যান্য স্বতন্ত্র সাংসদকে পাশে পেয়েছেন, তবে বেশির ভাগ সময়ই একা। প্রবল বিরোধিতার মধ্যেও এম এন লারমা গণপরিষদে যেসব ভাষণ দিয়েছেন কিংবা একেকটি অধিবেশনে বিল সম্পর্কে মূল্যবান মতামত দিয়েছেন তার প্রত্যেকটি একান্তভাবে ব্যতিক্রমী ও জনমানুষের পক্ষে। এখানে সাধারণভাবে আমরা তার মানবমুক্তির রাজনীতি এবং বিশেষভাবে আদিবাসী জাতি জনগোষ্ঠীর পরিচয় ও স্বীকৃতির রাজনীতিকে দেখতে পাই।

আজীবন মার্কসবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী ও সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা থেকেই এম এন লারমা গণপরিষদে আদিবাসী অঞ্চলকে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত, স্বশাসিত অঞ্চল ঘোষণা, আধিপত্যবাদী বাঙালি জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীর পরিচয়ের স্বীকৃতি, বাঙালি ও আদিবাসীসহ মানুষের মতো সকল মানুষের বাঁচার অধিকারের প্রশ্ন, শ্রমিক- কৃষক- মেহনতি-পতিতা- দলিতসহ সকল মানুষের ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ, তাদের অন্ন-বস্ত্র- বাসস্থান- শিক্ষা- স্বাস্থ্য- বেকারত্ব-অধিকার, শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সুনির্দিষ্টভাবে ভূমিসংস্কার, আয়কর, রাজস্ব, জুম ও কৃষিপ্রশ্ন, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও সংবিধান তৈরি, রাষ্ট্রের ইসলামীকরণ তথা অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স (ওয়াইসি)-তে যোগদানের প্রতিবাদ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা ও গণহত্যার সাথে যুক্ত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার; সংবাদপত্র ও বাক-স্বাধীনতার অধিকার; সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাসহ সহযোগী বিদেশি রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, কারাগারের উন্নয়ন ও তৃতীয় শ্রেণির বন্দিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রপতির ভাষণের অসারতা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক বক্তৃতা করেন।

সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম, নীতি-পলিসি এবং প্রতিষ্ঠানকে জনবিরোধী অবস্থান থেকে মানবিক, গণতান্ত্রিক অবস্থানে রূপান্তরিত করার জন্য সংসদে তিনি সবসময়ই উচ্চকিত সরব ভূমিকা নিয়েছেন। সামন্তবাদী, অগণতান্ত্রিক, স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চরিত্র ও খোলনলচে পাল্টে বাংলাদেশকে একটি শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সবসময়ই কাজ করেছেন। আমরা জানতে পাই, ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বেশির ভাগ সময়ই আব্দুল্লাহ সরকারের মতো দুয়েকজন জনপ্রতিনিধির সহযোগিতা ছাড়া স্রোতের বিপরীতে গিয়ে সকল সংসদ সদস্যের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে একা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। আমার পাঠ থেকে যে উপলব্ধি হয়েছে তা হলো, কোনও একটি দেশের অভ্যন্তরে থাকা একটি প্রান্তিক জাতি জনগোষ্ঠীর নেতা হয়ে সামগ্রিকভাবে দেশের সকল শ্রেণি পেশার মানুষজনের জন্য মুক্তির বার্তা বহনকারী এমন সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন চৌকস নেতৃত্ব বাংলাদেশের ইতিহাসে আর সৃষ্টি হবে কিনা আমি সন্দেহগ্রস্থ।

বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ থেকে আমরা জানতে পাই যে, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে সামরিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করলে তিনি আত্মগোপনে চলে যান। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির গেরিলা ও সামরিক বাহিনী শান্তিবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রীয় বাহিনীর আধিপত্যবাদী নীতি ও কার্যক্রমের প্রতিবাদ, পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিকরণের বিরোধিতা এবং পাহাড়ে সেনাবাহিনী সহ রাষ্ট্রীয় বাহিনীর শোষণ, নির্যাতন, অত্যাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সামরিক যুদ্ধে সরাসরি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। এম এন লারমার রাজনৈতিক সহকর্মী, গেরিলা যোদ্ধা ও অন্যান্যদের জবানবন্দি, স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, তিনি গেরিলাযুদ্ধের সময়ে পার্টির প্রধান হয়েও অত্যন্ত নির্লোভ, সৎ, নিরহঙ্কারী, মানবিক জীবন-যাপন করতেন। পাহাড়ের নিরক্ষর মানুষজনকে ঐক্যবদ্ধ করতে গিয়ে একেবারেই তাদের সঙ্গে মিশে যেতেন।

এত বড় নেতা হয়েও সাধারণ আদিবাসী জনগণের সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সরাসরি উদ্বুদ্ধ করতেন। তাদেরকে সংগঠিত করতেন, প্রশিক্ষণ দিতেন। মানবিক জীবনবোধে অভ্যস্ত মানুষটি সকল মানুষকে পরিবেশ, প্রতিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল মানবিক আচরণের শিক্ষা দিতেন। পাহাড়ের আদিবাসীদের জন্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্কুলসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। সরাসরি শিক্ষাদানের সাথে যুক্ত ছিলেন বলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরিসহ স্বউদ্যোগেই শিক্ষা বিস্তারের কাজ করে গেছেন। এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে এরচেয়ে বেশি বর্ণনা করার সুযোগ নেই।

আমি পার্বত্য চট্টগ্রাম, আদিবাসী আন্দোলন এবং এম এন লারমা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ছাত্র থাকার সময় থেকেই এখনো পর্যন্ত যা বুঝতে পেরেছি অথবা আমার যতটুকু সচেতনতা তৈরি হয়েছে তা থেকে বুঝতে পেরেছি তা হলো, এম এন লারমা আজীবন মানুষের মধ্যে আদর্শ ও ন্যায় যুদ্ধের আলোক প্রক্ষেপণের চেষ্টা করে গেছেন। আদিবাসী জাতি জনগোষ্ঠীসহ বাঙালি জাতির প্রত্যেকটা শ্রেণি পেশার মানুষের সামগ্রিক মুক্তির জন্য কাজ করেছেন। এম এন লারমার যৌক্তিক আন্দোলন ও পরবর্তীতে তার সংগ্রামের ধারাবাহিকতাতেই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিশেষ অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তাই আজকের দিনে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে হলো তাঁকেও তার রাজনৈতিক দর্শন সাম্যবাদ ও যুক্তিকে লালন করতে হবে। তবে দেশে সাধারণভাবে মানুষের মুক্তিও বিশেষভাবে আদিবাসীদের মুক্তি সম্ভব।

বি:দ্র: লেখাটি ১০ নভেম্বর ২০১৮ সালে প্রকাশিত বিডিনিউজ২৪.কম থেকে নেয়া।

এম এন লারমার সংগ্রাম শেষ হয়নি

সোহরাব হাসান

আজ ১০ই নভেম্বর। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার (এম এন লারমা) মৃত্যুবার্ষিকী। তিনি ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। সাবেক পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ এবং বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের পার্বত্য চট্টগ্রাম-১ আসন থেকে নির্বাচিত সদস্য।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গেল শতকের ষাটের দশকে এম এন লারমা ও সন্তু লারমা (জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা) প্রমুখ রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরুর আগে পাহাড়ে শিক্ষা আন্দোলন করেছিলেন। এর অংশ হিসেবে চাকমা জনগোষ্ঠীর মধ্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী প্রায় সবাই পেশা হিসেবে শিক্ষকতা বেছে নেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন, কোনো জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। এ কারণে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী সার্বিকভাবে শিক্ষায় পিছিয়ে থাকলেও চাকমা সম্প্রদায় এগিয়ে ছিল। এখনো এগিয়ে আছে।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের গণপরিষদে যে সংবিধান পাস হয়, তাতে বাঙালি ছাড়া অন্য কোনো জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি ছিল না।

সংবিধানের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়, ‘বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে, বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন।’

এর প্রতিবাদে ওয়াকআউট করেছিলেন পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি এম এন লারমা। এর আগে খসড়া সংবিধানের ওপর গণপরিষদে যে বিতর্ক হয়, তাতে অংশ নিয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘সংবিধান হচ্ছে এমন একটা ব্যবস্থা, যা অনগ্রসর জাতিকে, পিছিয়ে পড়া ও নির্যাতিত জাতিকে অগ্রসর জাতির সঙ্গে সমানতালে এগিয়ে নিয়ে আসার পথনির্দেশ করবে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে এই পেশকৃত সংবিধানে সেই রাস্তার সন্ধান পাচ্ছি না।’

এম এন লারমা ছিলেন এমন এক নেতা, যিনি শুধু তাঁর জাতিগোষ্ঠীর জন্য সংগ্রাম করেননি, লড়াই করেছেন বাংলাদেশের সব জাতির নিপীড়িত মানুষের জন্য।

এম এন লারমার জন্ম ১৯৩৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরে রাঙামাটি পার্বত্য জেলার নানিয়ারচরের বুড়িঘাট ইউনিয়নের মহাপুরম গ্রামে। তাঁর ডাকনাম ছিল মঞ্জু। জনসংহতি সমিতির নেতা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র লারমা ওরফে সন্তু লারমা তাঁর ছোট ভাই।

এম এন লারমার শিক্ষাজীবন শুরু মহাপুরম জুনিয়র হাইস্কুল থেকে। তিনি ১৯৫৮ সালে রাঙামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৬০ সালে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, ১৯৬৫ সালে বিএ, ১৯৬৮ সালে বিএড ও ১৯৬৯ সালে এলএলবি পাস করেন।

তিনি ১৯৬৬ সালে খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারি শিক্ষক পদে যোগদানের মধ্য দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। এম এন লারমার রাজনীতিতে হাতেখড়ি গেল শতকের পঞ্চাশের দশকে, যখন তিনি স্কুলের ছাত্র। ১৯৫৭ সালে তিনি গড়ে তোলেন পাহাড়ি ছাত্র আন্দোলন এবং ১৯৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দেন।

এম এন লারমা বরাবর ছিলেন গণমানুষের মুক্তির পক্ষে। সমাজতন্ত্র, তথা শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর লক্ষ্য। ১৯৭০ সালে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্তুঙ্গ জোয়ারেও তিনি প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এ থেকে ব্যক্তি ও নেতা এম এন লারমার জনপ্রিয়তা অনুমান করা যায়।

১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি এম এন লারমার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, যার পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয় পাহাড়ের ১১টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী। পঁচাত্তরের পর সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান হাজার হাজার বাঙালিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে গিয়ে সেখানকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করেন। বহু বছর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে যেসব বাঙালি ছিলেন, পাহাড়িদের সঙ্গে তাঁরা মিলেমিশেই বসবাস করছিলেন। কিন্তু জিয়াউর রহমান যাঁদের পাঠালেন, তাঁদের একাংশ জবরদখল শুরু করেন।

বাংলাদেশ সংবিধান পাহাড়িদের পৃথক জাতিসত্তার কথা স্বীকার করেনি। এ নিয়ে এম এন লারমার মনে ক্ষোভ ছিল। তারপরও তিনি ভেবেছিলেন গণতান্ত্রিক উপায়ে পাহাড়িদের পক্ষে লড়াই করবেন। এই বিবেচনায় তিনি বাকশালেও যোগ দেন। কিন্তু পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এম এন লারমা ও তাঁর সহযোগীরা আত্মগোপনে চলে যান। গড়ে তোলেন শান্তি বাহিনী নামে জনসংহতির সশস্ত্র শাখা। পরের ইতিহাস সবার জানা।

কর্ণফুলীর স্রোতে মিশে গেছে অসংখ্য পাহাড়ি ও বাঙালির রক্ত। রাষ্ট্রের ভুল সিদ্ধান্তে রক্তাক্ত হয়েছে পাহাড়ের সবুজ ভূমি,

চিরকাল পাশাপাশি বাস করা পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যকার সম্প্রীতির বন্ধন টুটে যায়। বেড়ে যায় হিংসা ও হানাহানি। কোনো জাতিগোষ্ঠীর ক্ষতি শুধু সংখ্যা দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। প্রতিটি মৃত্যুর পেছনে থাকে অপূরণীয় বেদনা, অপরিসীম কষ্ট ও হাহাকার।

অন্যান্য আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টিতে যেমন নানা কারণে অন্তর্দলীয় বিরোধ দেখা দেয়, জনসংহতি সমিতিও তার ব্যতিক্রম ছিল না। শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষ গ্রুপের হাতে জীবন দিতে হয় এম এন লারমাকে, ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর।

কিন্তু তাঁর সংগ্রাম ও সাধনা বৃথা যায়নি। যে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি লড়াই করেছিলেন, তাদের কিছুটা হলেও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি মিলেছে।

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার পাহাড়িদের দাবি স্বীকার করে নিয়ে সই করে পার্বত্য চুক্তি, যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু সেই চুক্তির অনেক ধারাই এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। বিশেষ করে পাহাড়িদের ভূমি সমস্যার সমাধান হয়নি। পার্বত্য চুক্তি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলেই বলা যাবে এম এন লারমার সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ সার্থক হয়েছে।

সোহরাব হাসান: প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক ও কবি

> ‘কৃষির উন্নয়নের দিকে যেমন আমাদের নজর দিতে হবে, তেমনি আমাদের শিল্প ও কল-কারখানার দিকেও নজর দিতে হবে। শিল্প ক্ষেত্রে আমরা যেন পিছনে পড়ে না থাকি এবং শিল্পোন্নতিতে আমরা যেন অন্য রাষ্ট্রের বা উন্নতিশীল দেশের সম মর্যাদায় পৌঁছতে পারি, সেদিকে আমাদের চেষ্টা করতে হবে। আমাদের যেসব কল-কারখানা এখনও অকেজো বা অক্ষম হয়ে পড়ে আছে, সেগুলো আস্তে আস্তে কর্মক্ষম করতে হবে এবং ধীরে ধীরে সেগুলিকে উন্নতমানে নিয়ে যেতে হবে। আমরা যেন সব বিষয়ে স্বনির্ভরশীল হতে পারি।’
>
> *– এম এন লারমা*
>
> *বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনার উপর মতামত,*
>
> ২৩ *জুন* ১৯৭৩, *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক, খণ্ড* ২ *সংখ্যা* ১৭

কবিতা

ন চাং যেবার এ জাগান ছাড়ি

কীর্তিমান আদিবাসী নেতা এম এন লারমা স্মরণে

হাফিজ রশিদ খান

এখানেই রয়ে যাবো থির পাহাড়ের মতো
গুরুগম্ভীর মেঘের ভার বজ্রবৃষ্টিসহ হেঁকে যাচ্ছে মাথার ওপর
ঘোলাজলে ঝিরির পাশের মুথাঘাস
সজনের চারা
ঝরে পড়া নিমপাতা
সত্রংফুলের ডগা
মিলে যাচ্ছে বড়গাঙের ভয়াল স্রোতে
খাক হয়ে যাচ্ছে এ শরীর পোড়াগাছের ধরনে
তবু এখানেই দাঁড়িয়ে রইবো একা
সরাতে পারবে না তো কেউ
এই ভিটি
এই বসতের গ্রন্থি থেকে
দুমড়ে-মুচড়ে পড়ে রবো মৃত গবাদিপশুর মতো
স্বজনের আসা-যাওয়ার পথের ধারে
যাবো নাকো ওড়ে উত্তর-দখিন-পুবে কি পশ্চিমে
নানা কিসিমের দৈত্যের ফোঁসানি শুনছি, সরোষে
ভাঙছে চূড়ার বৃক্ষডাল
পাহাড়ের শিথিল পাঁজর
হেলে পড়ছে ঘরের চালে
তবু থির রবো আমি
জন্মের মাটির গভীরে পা রেখে
ঠিক একরোখা মুক্তিসৈনিকের মতো ...

ন চাং যেবার এ জাগান ছাড়ি ... : রনজিত দেওয়ান রচিত চাকমা গানের কলি : এই জায়গাটা ছেড়ে কোথাও যাবো না :: সত্রং : চাকমা শব্দ : একধরনের পার্বত্যফুল

প্রতিজ্ঞা

শৈলেন চাকমা

অদম্য সাহস মুষ্ঠিবদ্ধ শপথে
যৌবনের মহাসঙ্গীতের বাঁধ নির্মাণে,
শত শত তরুণ সুর মেলাও এক কণ্ঠে।

প্রতিবাদের কণ্ঠে- শাসক গলা চেঁপে ধরে,
বন্দী কারাগারে লোহার শিকল গলায় পরিয়ে;
বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গের বাতাবরণে,
কালো আকাশে রক্তিম সূর্য জেগেছে।

নব চেতনায় উদ্দীপ্ত পথযাত্রী পৌঁছেছে সবুজ পাহাড়ে,
বিষন্ন ক্লান্তিহীন যাত্রাপথে মুক্তির টানে;
ঝাঁক বেঁধেছে পাহাড় থেকে সমতলে।

দীর্ঘযাত্রার ক্লান্তি শিখিয়েছে- সময়ের দাবি
বাঁধা পেরিয়ে, হবো মোরা জয়ের যাত্রী;
সবুজ পাহাড় লুকিয়ে কণ্টক ঝোপের আড়ালে,
শপথ নিয়ে শত শত তরুণ পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে।

ডিঙিয়ে যাবো মশাল হস্তে বিজয়ের অন্তিমে,
উঠবে জেগে নবীন শত অন্যায়-অভিশ্রান্ত মুছে;
যন্ত্রণার বন্দীশালায় আগুন জ্বালিয়ে,
আনবো মোরা মুক্তির আলো ছিনিয়ে।

মহান নেতা

শান্তি দেবী তঞ্চঙ্গ্যা

অন্ধকার সরিয়ে এক আলোর প্রদীপ হয়ে
এসেছিলে আমাদের মাঝে ।
মুক্তির মশাল জ্বালিয়ে রুখে দাঁড়াতে শিখিয়েছিলে অসহায়
জুম্ম জাতিকে
তুমি ঘুমন্ত জুম্মদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে সৃষ্টি করেছো আলোড়ন
তুমি কান্ডারি, মহাবিপ্লবী, তুমিই জুম্ম জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা ।
আজ তুমি নেই কিন্তু আলোর রশ্মির মতো জ্বলছে তোমার
আদর্শ চেতনা ।

সেদিন ১০ই নভেম্বর ভোর রাতে গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ
চক্রের কালোহাত
কেড়ে নিয়েছিলো মহান নেতার তাজা প্রাণ ।
সেদিন তোমায় হারানো শোকে আর্তনাদে কেঁপে উঠেছিলো
জুম ভূমি ।
সেদিন জুম্ম জাতি হারিয়েছে তার জাগরণের অগ্রদূতকে
পাহাড়ে নেমেছিলো শোকের ছায়া ।
কিন্তু জুম্ম জাতি শুধু তোমার দেহটি হারিয়েছে
হারায়নি তোমার আদর্শ চেতনা ।
তুমি জুম পাহাড়ের মাটিতে বিপ্লবের বীজ বপন করেছিলে ।
তাই তুমি জুম্মদের অন্তরে আজো বেঁচে আছো এই পাহাড়ের
সংগ্রামের ইতিহাস হয়ে ।

তুমি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ।
তোমার চেতনার মৃত্যু নেই তোমার আদর্শ হোক হাজার
তরুণের সাধনা ।
জাতির এই দুর্দিনে অসীম সাহস ও আদর্শ নিয়ে এগিয়ে আসুক
তরুণ সমাজ ।
তরুণ প্রজন্মের মেধা, ঘাম, রক্ত ও জীবন দিয়ে অর্জিত হোক
পরাধীনতার শৃঙ্খলা থেকে মুক্তি
মহান নেতা তোমার আর্দশ হোক প্রজন্ম হতে প্রজন্মে বহমান
নদীর মত ।

স্মরণসভা

ড. আর এস দেওয়ানের স্মরণে

জ্যোতিপ্রভা লারমা

ডক্টর রামেন্দু শেখর দেওয়ান আমার আপন ছোট মামা হন। ছোট বেলায় তাঁর সান্নিধ্যে থেকে তাঁকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি আমার চেয়ে কয়েক বছর বয়সে বড় ছিলেন। আজকে তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে কিছু কথা বলবো–

ডক্টর রামেন্দু শেখর দেওয়ান ১৯৪৫ সাল হতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে থেকে মাওরুম জুনিয়র হাই স্কুলে ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে অধ্যয়ন করেছেন। ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে মেধা বৃত্তি পেয়ে প্রতি মাসে ৬ টাকা পেতেন।

তিনি আমার বাবার অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র ছিলেন। বাবা তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি শান্ত-শিষ্ট, নম্র-ভদ্র ও ধীর স্থির স্বভাবের ছিলেন এবং প্রচুর পড়াশুনা করতেন। পড়াশুনার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ দেখে আমার বাবা তাঁকে আমাদের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি আমার মাকে গৃহস্থালীর কাজে সাহায্য করতেন এবং বাড়িতে অতিথি আসলে আপ্যায়নে সহযোগিতা করতেন। গ্রামের প্রতিবেশীদের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন ফলে প্রতিবেশীরাও তাকে খুব ভালোবাসতেন।

আমার বাবার অনুপস্থিতিতে তিনি আমাদের পড়াশুনায় সুদৃষ্টি দিতেন। মামা ডক্টর রামেন্দু শেখর দেওয়ান সব সময় পড়াশুনা ও কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। পোশাক-পরিচ্ছদে অত্যন্ত সাদা-সিধে জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। বাল্যকাল থেকে মানব দরদী ছিলেন। তাই গরীব-দুঃখী মানুষের প্রতি সহানুভূতি ছিলেন এবং তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতেন। তিনি আমার পিতা-মাতার চিন্তা ও চেতনার অনুসারী ছিলেন।

আমার বাবা মাওরুম স্কুলে পড়ার সময় তাঁর নাম রেখেছিল- রক্তোৎপল দেওয়ান। পরে রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তির সময় নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় রামেন্দু শেখর দেওয়ান। সেখান থেকে ১৯৫২ সালে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে মেট্রিক পাশ করেন এবং জেলা বৃত্তি অর্জন করে মাসে ৩০ টাকা হিসেবে পেতেন। তিনি চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে ১৯৫৫ সালে প্রথম বিভাগে আইএসসি পাশ করেন।

তিনি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতেন সে সময়ে আমি পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পে এক বছর তেজগাঁও এলাকায় ট্রেনিং-এ অংশগ্রহণের জন্য ঢাকা যাই। তখন আমি মাঝে মাঝে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে হলে যেতাম। তখন হলে তিনি ও শরবিন্দু শেখর চাকমা একসাথে থাকতেন। হলে থাকার সময় তাঁকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও গোছালো জীবন-যাপন করতে দেখেছি।

লেখাপড়ার জন্য বিদেশে যাওয়ার আগে তাঁর সাথে আমার বড় মামার বাড়ি রাঙ্গামাটিতে শেষ দেখা ও কথা হয়েছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন– ভালো থেকো, যোগাযোগ রেখো। আমি যে উদ্দেশ্যে বিদেশে যাচ্ছি, সে কাজে যেন সফল হয়ে ফিরতে পারি প্রার্থনা করো। সে সময়ে তিনি আমার মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানান। লন্ডনে যাবার পরও দু'একটি চিঠি আদান-প্রদান হয়েছিল। তিনি তাঁর শেষ চিঠিতে- বাঁশ কোঁড়ল খাওয়ার ইচ্ছের কথা জানিয়েছিলেন।

যতদূর জানি তিনি পার্বত্য অঞ্চলকে খুবই ভালোবাসতেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের পশ্চাৎপদ ও বঞ্চিত জুম্ম জনগণের স্বাধীকারের কথা ভাবতেন। তাই তিনি তাদের জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য পূরণে জুম্ম যুব সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির আন্তর্জাতিক মুখপাত্র ডক্টর রামেন্দু শেখর দেওয়ানের মৃত্যুতে জনসংহতি সমিতি কর্তৃক ভার্চুয়াল মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন উপলক্ষ্যে আয়োজিত স্মরণ সভায় স্মৃতিচারণমূলক এই লেখাটি উপস্থাপন করি।

ড. আর এস দেওয়ান ছিলেন জুম্ম জনগণের দূত: স্মরণসভার বক্তারা

২৫ জুলাই ২০২১

On the 29th of March, 2021, Dr. Ram
Shekhar Dewan passed awa
at the age of 89 in his
in Manchester, UK. He
ration of Dr. Ramendu
life and to honor and
contributions
e cause, a

স্মরণসভার বক্তারা বলেন, ড. আর এস দেওয়ান ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে একজন রাষ্ট্রদূত। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাটি জাতিসংঘ থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরেন। তিনি ছিলেন নিঃস্বার্থ ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তি, একজন আপোষহীন সংগ্রামী। তিনি সাধাসিধে জীবনে অভ্যস্ত ও একজন নীরব প্রচার সৈনিক। তিনি জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে অনুপ্রেরণার উৎস, একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র।

গত ২৫ জুলাই ২০২১ বাংলাদেশ সময় বিকাল ৬:৩০ ঘটিকা থেকে প্রধীর তালুকদার রেগার সঞ্চালনায় যুক্তরাজ্য প্রবাসী সদ্য প্রয়াত ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ানের স্মরণে 'ড. রামেন্দু শেখর: আমা পজিমর শুকতারা' ('ড. রামেন্দু শেখর: আমাদের পশ্চিমাকাশের শুকতারা) শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক অনলাইন স্মরণসভা (চাকমা ভাষায়) অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণসভার শুরুতে এবং আলোচনার পূর্বে প্রয়াত ড. আর এস দেওয়ানের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির আন্তর্জাতিক মুখপাত্র ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ান গত ২৯ মার্চ ২০২১ যুক্তরাজ্যের ম্যানচেষ্টারে নিজ এ্যাপার্টমেন্টে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রধীর তালুকদার রেগার সঞ্চালনায় স্মরণসভার উদ্বোধনী ও সমাপনী বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ থেকে চাকমা সার্কেল চীফ রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়। এছাড়া এতে আলোচক হিসেবে আরো অংশগ্রহণ করেন নরওয়ে থেকে রাজকুমারী চন্দ্রা রায়, বাংলাদেশ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য গৌতম কুমার চাকমা ও ড. দেওয়ানের স্কুল জীবনের সহপাঠী ডা. সুব্রত চাকমা, কানাডা থেকে ডা. চিরঞ্জীব তালুকদার, ড. আদিত্য কুমার দেওয়ান ও প্রীতিবিন্দু চাকমা, যুক্তরাজ্য থেকে নান্টু চাকমা ও উজ্জয়িনী রায়, অস্ট্রেলিয়া থেকে কুলোত্তম চাকমা, ভারতের ত্রিপুরা থেকে কবি ও সাহিত্যিক নিরঞ্জন চাকমা, বাংলাদেশ থেকে প্রফেসর মংসানু চৌধুরী, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক সন্তোষিত চাকমা বকুল ও অধ্যাপক মধু মঙ্গল চাকমা প্রমুখ।

এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির সভাপতি গৌতম দেওয়ান, ভারতের ত্রিপুরা থেকে শান্তি বিকাশ চাকমা, লন্ডন থেকে লাল আমলাই বম, অস্ট্রেলিয়া থেকে এমরিপের সদস্য বিনোতাময় ধামাই, জার্মানি থেকে বাবলু চাকমাসহ অনেকেই আলোচনায় সার্বক্ষণিকভাবে যুক্ত ছিলেন।

‘রামেন্দু বাবু পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের দূত হিসেবে কাজ করেন’: রাজা দেবাশীষ রায়

রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায় প্রধীর তালুকদারকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ানের স্মৃতির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়ে উদ্বোধনী আলোচনা শুরু করেন।

রাজা দেবাশীষ রায় বলেন, একবার কি দুইবার রামেন্দু বাবুর (ড. আর এস দেওয়ান) সাথে সামনাসামনি দেখা হয়েছে। তবে যোগাযোগ ছিল। আমাদের জুম্মদের জন্য, আদিবাসীদের জন্য তিনি কয়েকটি চিহ্ন বা স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কিছু বিষয়ে তিনি আমাদের জন্য এক রোল মডেল। এক. আমরা জানি, জাতিসংঘে জুম্মদের পদার্পণ এবং জুম্মদের অধিকারের পক্ষে কথা বলার কাজটা প্রথম শুরু করেন রামেন্দু বাবু। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইস্যুটা আন্তর্জাতিক অঙ্গণে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তিনিই সর্বপ্রথম। এখানে আমার বড় বোন দিদি চন্দ্রা রায় আছেন, তিনি আমার চেয়ে বেশি জানেন, আশাকরি তিনি বলবেন, ১৯৮৪ সালে বা তারও আগে জাতিসংঘের আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপে সর্বপ্রথম তিনি আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের কথা বলেন। এর পরপরই রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথেরো, এরপর শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে, এরপর তো কাজেই রাজকুমারী চন্দ্রা রায় গেছেন, অনেকেই গেছেন, জনসংহতি সমিতির সিনিয়র নেতারা গেছেন। আমিও যাই, বিনোতাময় ধামাই এখন এমরিপের সদস্য হিসেবে আছেন। সেই যে রামেন্দু বাবু প্রথমে গেছেন, এরপরই তো অন্যান্যরা যান।

তিনি বলেন, দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছে, তিনি জেএসএস’র ইউরোপের প্রতিনিধি ছিলেন, যেটা জেএসএস’র মাননীয় সভাপতি সন্তু লারমা তাঁকে দায়িত্ব প্রদান করেন। এছাড়া তিনি কেবল জেএসএস’র প্রতিনিধি নয়, তিনি বস্তুত আমাদের জুম্মদের, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের একজন রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করেন বলে বলা যেতে পারে।

তিনি বলেন, এই যে লর্ড এভেবুরীর কথা আমরা তুলেছি। একটা আলমিরাতে নাকি জায়গা হতো না, সপ্তাহে একটা চিঠি তিনি লর্ড এভেবুরীকে রিপোর্ট লিখে পাঠাতেন, আমার বাবা রাজা ত্রিদিব রায়সহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও কর্তৃপক্ষকে তিনি রিপোর্ট পাঠাতেন।

তিনি আরও বলেন, লর্ড এভেবুরী, যিনি ছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি মানবাধিকার কমিটির ভাইস চেয়ার। এই লর্ড এভেবুরীর সাথে তিনি যোগাযোগ রাখতেন এবং তাঁকে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের সমস্যাটি তুলে ধরে রিপোর্ট পাঠাতেন। পরে সেই এভেবুরীই পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কমিশনের কো-চেয়ার ছিলেন। যিনি আমাদের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছেও যেতেন। কারণ জননেত্রী শেখ হাসিনা যখন বিরোধী দলীয় নেতা ছিলেন, তিনিও লর্ড এভেবুরীর কাছে যেতেন। এই লর্ড এভেবুরী কিন্তু বাংলাদেশের মানবাধিকারের জন্য যেমনি, তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের জন্যও কাজ করেন। এই লর্ড এভেবুরীর সাথে আমাদের যে একটা বন্ধুত্ব হয়েছে, আমি মনে করি সেটার সূত্রপাত করেন রামেন্দু শেখর দেওয়ান।

রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায় আরও বলেন, আমার মনে আছে, ১৯৮০ নাকি কোনো এক সময়, আমার বাবা রাজা ত্রিদিব রায় আর আমি, দুই পিতা-পুত্র, লর্ড এভেবুরীর কাছে দেখা করতে যাই। ব্রিস্টনের কাছে তাঁর বাড়িটি ছিল। তিনি আমাদের রামেন্দু শেখর দেওয়ানের চিঠি দেখিয়ে বলেন, এই দেখুন রামেন্দু শেখর দেওয়ানের চিঠি। তিনি (রামেন্দু বাবু) ছিলেন ইংরেজিতে যাকে বলে ‘সেল্‌ফলেস’ (নিঃস্বার্থ), অর্থাৎ একেবারে নিজের স্বার্থের জন্য নয়, পরের স্বার্থে কাজ করা এক মানুষ।

তিনি আরও বলেন, এই লোকটির একটি পিএইচডি ডিগ্রি আছে। তিনি যদি চাকরি করতেন, তাঁর কি টাকার অভাব হতো? অথচ তিনি সেই একটি ছোট ঘরে বসবাস করতেন। আমি তার বাড়িতে যাইনি, শোনা কথা। আমার মেঝো পিসি রাজকুমারী মৈত্রী হিউম বলেন, তিনি নাকি তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে একটি কম্পিউটার কিনে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা নেননি। পরে নাকি একটা টাইপ রাইটার কিনে দেওয়ার জন্য রাজী করানো হয় এবং একটি টাইপ রাইটার কিনে দেওয়া হয়। সেটা দিয়েই তিনি লেখালেখি করতেন। তিনি নাকি টাকা দিলেও নিতে চান না। জোর করে দিতে হতো। ১৯৮০’তে যখন দেখা হয়, তখন তিনি বেকার ভাতা পেতেন, তা দিয়েই কোনোরকমে চলতেন। এখন তিনি প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর বই, তাঁর লেখালেখির দলিল কী কী আছে আমি জানি না। যারা যুক্তরাজ্যে আছেন, তাদের সেগুলো সংরক্ষণ করে দেওয়া উচিত আমাদের জুম্মদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য।

তিনি বলেন, ১৯৮০ সালে যখন আমরা একত্রিত হই বাবার সাথে। সেখানে বাবা আমাকে কিছু টাকা দেন। সম্ভবত তাঁরা সকালে কথা বলেন। কিন্তু তখন বোধ হয় তিনি টাকাগুলো

দিতে পারেননি। বাবা আমাকে বলেন, টাকাগুলো দিয়ে এসো। বাবা বলেন, তিনি নিতে চাইবেন না কিন্তু। তুমি পকেটে রেখে দিয়ে আসবে। আমি তখন ছাত্র। তবে তখন আমি রাজা হয়েছি। লন্ডনে যখন আমাদের দেখা হয়, তখন আমি তাঁকে টাকাগুলো দিতে গেলে তিনি ‘না না..’ বলে নিতে অস্বীকার করেন। আমি বললাম, ব্যক্তিগত কাজের জন্য তো নয়, আপনি জাতির জন্য কাজ করেন, সেইজন্যই বাবা এই টাকাগুলো দিয়েছেন জাতির কাজে লাগাবার জন্য। সেটা এখনও আমার মনে আছে।

রাজা দেবাশীষ রায় আরও বলেন, আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ এখন তো আর নেই। এখন মানবাধিকার সংক্রান্ত কমিশনও নেই। এখন আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরাম হয়েছে, আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কর্মব্যবস্থা (এমরিপ) হয়েছে, মানবাধিকার কমিশন এখন মানবাধিকার পরিষদে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু তখন তিনি আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপে আমাদের জুম্মদের জন্য কথা বলতেন। তিনি প্রফেসর ড. এরিকা ডায়াস, আমরা যাকে ইন্ডিজেনাস পিপলস-এর মা, মাতামহী বলি, তিনি তখন চেয়ারপার্সন ছিলেন। তখন আমাদের রামেন্দু বাবু মাইক পেলে নাকি ছাড়তেন না। তিনি জুম্মদের কথা বলতেন। শুনেছি, চেয়ারপার্সন নাকি বলতেন, ড. দেওয়ান, দিস ইস নট এ কমপ্লেইন চেম্বার। প্লিজ, প্লিজ, মেক দ্য স্পিচ শর্ট। কিন্তু তিনি নাকি মাইক বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত জুম্মদের জন্য কথা বলা থামাতেন না।

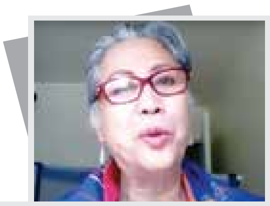

রামেন্দু বাবু আমাদের সকলের অনুপ্রেরণা, চলার পথে নক্ষত্রের মতো: রাজকুমারী চন্দ্রা রায়

নরওয়ে থেকে রাজকুমারী চন্দ্রা রায় আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, রামেন্দু বাবুর সাথে আমার প্রথম যোগাযোগ হয় যখন আমি লেখাপড়া করছিলাম, ল’ পড়ছিলাম। আমি রামেন্দু বাবুকে বলেছিলাম, একটি চিঠি লিখেছিলাম যে, রামেন্দু বাবু আমি তো আমার দেশের জন্য কাজ করতে চাই। আপনি তো আমাদের মধ্যে সবার সেরা, আপনি কী সহযোগিতা করতে পারবেন? তিনি আমাকে পরামর্শ দেন, না, এখন নয়, তুমি আগে লেখাপড়া শেষ করো। আমাদের আইনজীবী লাগবে, এরপরেই তুমি কাজে নামবে।

তিনি বলেন, রামেন্দু বাবুর সাথে আমার প্রথম দেখা হয় জেনেভায়। খুব সম্ভব জাতিসংঘের একটি অধিবেশনে। রামেন্দু বাবু তিন পৃষ্ঠার একটি সুন্দর বক্তব্য লেখেন। রামেন্দু বাবু সকালে এসে আমার নামটিও বক্তাদের তালিকায় তুলে দেন বক্তব্য রাখার জন্য। প্রথমে তিনি আমাকে একটি বড় আকারের স্যান্ডুইচ এনে দেন। আমাকে বলেন, এটা খাও, আগে কোমর শক্ত করো, তারপরে কাজে নামবে। তখনই প্রথম জাতিসংঘের অনুষ্ঠানে যাই। প্রথমবার কক্ষে প্রবেশ করে তো একটু ভয় ভয় লাগছিলো। সেখানে অনেক মানুষ। তিনি আমাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলেন, এখানে বস, এখান থেকে নড়বে না।

চন্দ্রা রায় স্মৃতিচারণ করে বলেন, তিনি (রামেন্দু বাবু) বললেন, জাতিসংঘের সভায় যখন একবার তোমার নাম বলবে, তখন যদি তুমি কথা বলতে না পারো, তাহলে তোমার সুযোগটা চলে যাবে। তিনি আমাকে বললেন, তুমি তো ইংরেজি জানো, গড় গড় করে পাঠ করে যেয়ো। তিনি আমার পেছনের সিটে বসেছিলেন আমার ভালোমন্দ দেখতে। কিন্তু গড় গড় করে বললেও পাঁচ মিনিটে বলা সম্ভব নয়। তাই আমি একটু সংক্ষিপ্ত করে বলি। তখন নাকি আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিনিধিকে প্রথমবার থামিয়ে দেয়া হয়নি। এর আগে নাকি প্রতিবার থামিয়ে দেয়া হতো। তবে রামেন্দু বাবু আমাকে দিয়ে খুব বেশি খুশি হতে পারেননি, কারণ বক্তব্যটা পুরোটা আমি পড়তে পারিনি। আপনারা তো জানেন, তাঁর লেখা এক পৃষ্ঠা যেমন ঘন, তেমন নিখুঁট। সেটাই ছিলো রামেন্দু বাবুর সাথে আমার প্রথম দেখা। তখন থেকে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা।

চন্দ্রা রায় আরও বলেন, আমার বাবার সাথে তাঁর খুব ভালো যোগাযোগ ছিলো। বাবা যখন লন্ডনে যেতেন, তখন প্রতিবার তার সাথে দেখা করতেন। তিনি সর্বদা আমাদের সকলের জন্য একজন অনুপ্রেরণা, যাকে বলে চলার পথে এক নক্ষত্রের মতো, আমাদের জাতি ও দেশের জন্য কাজের ক্ষেত্রে।

তিনি বলেন, এটা আমাদের সকলের জন্য, জাতির জন্য সৌভাগ্য যে তাঁর মত একজন বিরাট ব্যক্তিত্ব আমাদের ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের নামটা তো তিনিই আন্তর্জাতিকভাবে তুলে আনেন। সার্ভাইভাল ইন্টারন্যাশনাল, জাতিসংঘে তিনিই তো প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামের নামটি নিয়ে যান।

তিনি আরও বলেন, রামেন্দু শেখর দেওয়ানের আরও একটি বড় কাজ হচ্ছে, আপনারা তো সবাই মার্টিনেজ কোবোর জাতিসংঘে গবেষণার কথাটি জানেন। সেই গবেষণা কর্মটি ছিলো আদিবাসীদের উপর প্রথম লেখা, ৪ খণ্ডে লিখিত একটি বই। সেখানেই রামেন্দু বাবু পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে লিখিত তথ্য পাঠিয়ে দেন। মার্টিনেজ কোবোর বইয়ের প্রথম খন্ডে যে পার্বত্য চট্টগ্রামের কথাটি উঠে এসেছে সেটা রামেন্দু শেখর দেওয়ানের কারণেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

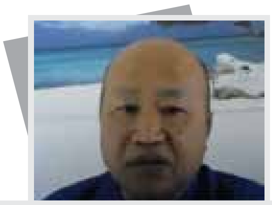

ঐক্যবদ্ধ থাকলে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলে বলতেন আর এস দেওয়ান: নান্টু চাকমা

লন্ডন থেকে নান্টু চাকমা বলেন, তাঁর সাথে প্রথম দেখা হয় জার্মানির বন শহরে। আগে তাঁর সম্পর্কে শুনতাম। আমি লিভারপুলে থাকতাম। ম্যানচেষ্টার থেকে মাত্র দেড় ঘন্টার দূরত্বে। আমি/আমরা দেখা করতে যেতাম। তিনি থাকতেন ছোট্ট ঘরে। মাত্র দুটি কক্ষ। তিনি হিটারও ব্যবহার করতেন না।

নান্টু চাকমা আরও বলেন, তিনি (ড. আর এস দেওয়ান) বলতেন, আমরা জুম্মরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকি তাহলে অবশ্যই পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। তিনি বলতেন, যতদিন বেঁচে থাকবেন জাতির জন্য কাজ করে যাবেন।

তিনি বলেন, তিনি কমই রান্না করে খেতেন। প্রায়ই ছোলা ভিজিয়ে খেতেন, ফলমূল খেতেন, দুধ খেতেন, সেভাবেই থাকতেন। আমরা মাঝেমধ্যে ভাত-তরকারি রান্না করে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতাম।

নান্টু চাকমা আরও বলেন, তিনি সবসময় আমাদের মাঝে থাকবেন। এখন আমাদের চেষ্টা করতে হবে তাঁর স্বপ্ন আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার যেন প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

তার মৃত্যুর খবর শুনে খুব খারাপ লাগে: ডা. সুব্রত চাকমা

ডা. সুব্রত চাকমা বলেন, আর এস দেওয়ান আমার স্কুল ও কলেজ জীবনে সহপাঠী ছিলেন। তবে পরবর্তী জীবনে তার সাথে আর দেখা হয়নি। তিনি বলেন, তিনি সেই সময় এম এন লারমা ও সন্তু লারমাদের বাসায় থাকতেন। ছোট মহাপুরম স্কুলে পড়ার জন্য। স্কুলটি তখন ভালো স্কুল হিসেবে পরিচিত। আমরা উভয়েই প্রাথমিক মেধাবৃত্তি পাই। ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম পর্যন্ত তিনি মহাপুরম থেকে মেধাবৃত্তি পান। আমি রাঙামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে পাই।

তিনি আরও বলেন, তিনি ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ফার্স্টবয় ছিলেন। ১০ম শ্রেণিতে তিনি জেলা বৃত্তি পান। পরে আমরা চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে ভর্তি হতে যাই। এরপর আমি ১৯৫৪ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হই। রামেন্দু বাবু আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হন। ইঞ্জিনিয়ারিং তিনি শেষ করতে পারেননি। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে এমএসসি পাশ করেন। এরপর তিনি সাইন্স ল্যাবরেটরিতে জুনিয়র সাইন্টিস্ট হিসেবে যোগদান করেন। এতে কয়েক বছর চাকরি করেন। এই অবস্থায় তিনি যুক্তরাজ্যে একটি বৃত্তি পান। লন্ডনে যাওয়ার পর তার সাথে আর দেখা হয়নি। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে আমার খুব খারাপ লাগে।

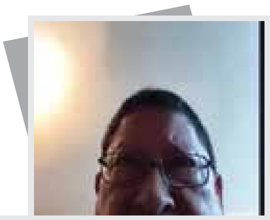

রামেন্দু বাবুর জীবনটা ছিল ‘এক্সট্রিমলি সিম্পল’: ডা. চিরঞ্জীব তালুকদার

কানাডা থেকে ডা. চিরঞ্জীব তালুকদার বলেন, রামেন্দু বাবুকে আমি বিলেতে থাকতে চিনতাম ১৯৬৮ সাল থেকে। যদিও বিলেতে থাকতে আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম, তবু রামেন্দু বাবুর সাথে আমার অনেকবার দেখা হয়েছে সেখানে। রামেন্দু বাবু তাঁর জীবনটা বিসর্জন দিয়েছেন। তিনি সালফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের শিক্ষক ছিলেন। তিনি জুম্মদের সাহায্য করার জন্য এবং জুম্মদের উপর যে দমন-পীড়ন সেটার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অঙ্গণে প্রচার করার জন্য তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে তার সমস্ত জীবনটা জাতির জন্য উৎসর্গ করেন।

ডা. তালুকদার আরও বলেন, লর্ড এভেবুরীর সাথে আমার বহুবার দেখা হয়। শেষবার দেখা হয় তাঁর মৃত্যুর দুই বছর আগে। তখনও তিনি রামেন্দু বাবুর রিপোর্টগুলো দেখান। রামেন্দু বাবু আমাকেও পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতি সংক্রান্ত অনেক রিপোর্ট পাঠাতেন। আমার কাছে সেই রিপোর্টগুলো এখনও আছে। আরও অনেক কাগজপত্র আমি কুলোত্তম বাবুকে দিয়েছি। তিনি অস্ট্রেলিয়া নিয়ে যান। আমার কাছে যেগুলো আছে সেগুলো আমি জুম্মদের জন্য সহজে প্রাপ্তির ব্যবস্থা করবো।

তিনি বলেন, রামেন্দু বাবুর জীবনটা ছিল ‘এক্সট্রিমলি সিম্পল’। যেখানে তিনি বসবাস করেন সেটা ছিল জর্জরিত অবস্থা। রামেন্দু বাবুকে আমি বহু বছর আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছি। টাকা প্রদান করলে গ্রহণ করেন না। কিন্তু ডাকে

পাঠালে পেতেন কিনা তা জানতাম না, তবে সেগুলো আর ফেরত আসতো না। তাঁর ছিল একটি ভাঙাচোরা টাইপ রাইটার। এত ভালো ইংরেজি লেখেন তিনি যা পড়ার মত। একেবারে পুরনো ব্রিটিশ ইংরেজি।

তিনি আরও বলেন, রামেন্দু বাবুকে যে আমরা স্মরণ করতে পারছি এজন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। তিনি যে এত কাজ করে গেছেন, তিনি কোনোদিন প্রচার করেননি। তিনি চরমভাবে বিনয়ী ছিলেন।

তাঁর আগে যুক্তরাজ্যে ও ইউরোপে কেউ সিএইচটি ইস্যুটি তুলে ধরেনি: উজ্জয়িনী

লন্ডন থেকে উজ্জয়িনী রায় ড. আর এস দেওয়ানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে চমৎকার আন্তর্জাতিক সম্মেলন করার জন্য প্রধীর তালুকদার ও প্রীতিবিন্দু চাকমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তাঁকে আমরা কখনো ভুলতে পারবো না। একজন ক্যাম্পেইনার হিসেবে রামেন্দু বাবুর অবদান অনস্বীকার্য। কারণ তাঁর আগে যুক্তরাজ্যে এবং ইউরোপে কেউ এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটি তুলে ধরেননি। এটা ছিল তাঁর অশেষ অবদান। তিনি যে বিভিন্ন সংগঠনে/প্রতিষ্ঠানে তথ্যবহুল রিপোর্ট পাঠাতেন সেগুলো এক পাতা, দুই পাতা নয়, ছিল তথ্যপূর্ণ প্যাকেট। সেই সময়ে (ডিজিটাল যুগের আগে) এগুলো মোটেও সহজ কাজ ছিল না। নিজে টাইপ করে, নিজের টাকায় তিনি এসব রিপোর্ট পাঠাতেন।

তিনি আরও বলেন, আমাদের রাজ পরিবারের অনেকের সাথে তাঁর খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। আমার সাথেও ভালো যোগাযোগ ছিল। তিনি ছিলেন অনন্য এক ব্যক্তিত্ব। ভদ্র, বিনয়ী। আর তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার প্রকৃতির মানুষও। আমি আশাকরি, আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁর জন্য কিছু করতে পারবো। জুম্মদের মুক্তির ব্যাপারে তিনি খুব আশাবাদী ছিলেন। তিনি বলতেন, আগামী বছরই কিছু একটা হবে।

রামেন্দু বাবু পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন: ড. আদিত্য কুমার দেওয়ান

কানাডা থেকে ড. আদিত্য কুমার দেওয়ান বলেন, আমার যোগাযোগ হয় ১৯৯১ বা ১৯৯২ সাল, আমার ঠিক মনে নেই। জয়তি গ্রেস আমাকে সাহায্য করতে পারে। আমি এখানে জয়তিকে দেখতে পাচ্ছি। আমরা একসঙ্গে ৩য় পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্মেলনে যোগ দিই। যেটা অনুষ্ঠিত হয় জার্মানিতে। আমি কানাডা থেকে সেখানে অংশগ্রহণ করি। সেখানে দীপঙ্কর তালুকদার ও রাশেদ খান মেননও যান। সেখানে আমরা লিখিত বক্তব্য রাখি। আরো অনেকেই অংশগ্রহণ করেন সেখানে। ভারত থেকেও অনেক প্রতিনিধি সেখানে আসেন। সেখানেই রামেন্দু বাবুর সাথে আমার প্রথম দেখা। এরপরও যখন আমি ইংল্যান্ডে যাই, তখন দুই/তিন বার দেখা হয় তাঁর সাথে। তাঁর বাড়িতে যাই ইন্দুদার সাথে, যখন ইন্দু দা বেঁচে ছিলেন।

তিনি বলেন, সংক্ষেপে বলি, পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনের ইতিহাসে তিনি ছিলেন গোড়াপত্তন ব্যক্তি। তিনিই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি সেই আন্দোলন শুরু করেছিলেন। যেটা রাজাবাবু ও চন্দ্রাও বলেছেন, আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ, যেটা এখন জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরাম হয়েছে, সেটার সাথে যুক্ত ছিলেন রামেন্দু বাবু। তারপর এন্টি স্লেভারি সোসাইটি এবং আরো অনেক মানবাধিকার সংগঠন আছে, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, ইবগিয়া, ওয়াচ গ্রুপ ফর ইন্ডিজেনাস পিপলস, সেগুলোর সাথে যুক্ত ছিলেন তিনি। একসময় আমরা যে সম্মেলনে যাই সেটাই ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন, সেটা আয়োজন করেন ওলফগ্যাং মে। আমি প্রথমত বলবো যে, আন্তর্জাতিক পরিসরে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত প্রচার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন রামেন্দু বাবু। দ্বিতীয়ত বলবো, রামেন্দু বাবুর দুটি জিনিস ছিল। একটি হচ্ছে তাঁর মিশন, আর অন্যটা হচ্ছে তাঁর ভিশন।

ড. আদিত্য কুমার আরও বলেন, তাঁর মিশনটি ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশের বাইরে প্রচারাভিযান এবং তিনি সেখানে ছিলেন। তিনি সবসময় পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন। আমি এটা তুলনা করছি যখন নাকি আমেরিকায় সামাজিক অধিকার আন্দোলন শুরু হয়, তখন ড. মার্টিন লুথার কিং বলতেন,

আমার একটি স্বপ্ন আছে। একইভাবে ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ানও স্বপ্ন দেখতেন, জুম্মদের মুক্তির স্বপ্ন।

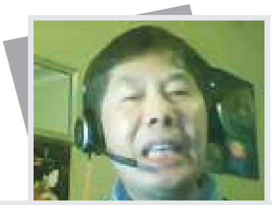

হোচিমিনের সাথে ড. আর এস দেওয়ানের অনেক মিল দেখি: কুলোত্তম চাকমা

অস্ট্রেলিয়া থেকে কুলোত্তম চাকমা বলেন, আমি যখন প্রথম অস্ট্রেলিয়ায় আসি ১৯৮৯ সালে, তখন তাঁকে আমি একটি চিঠি লিখি। তিনি তখন তাড়াতাড়ি আমার চিঠির উত্তর দেন এবং তখন থেকে তিনি সবসময় আমাকে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতি সংক্রান্ত চিঠি পাঠাতেন। আপনারা জানেন, এভাবে তিনি বহুজনকে চিঠি পাঠাতেন তাঁর সময় ও অর্থ ব্যয় করে। তিনি যে কত উৎসর্গীকৃত ছিলেন সেটা বলার নয়। এমন সময়ে তিনি আমাদের জন্য কাজ করেন, যখন আমাদের জন্য ছিল খুব কঠিন সময়। ১৯৭৫ হতে শুরু করে নব্বই দশক- এই সময়ে আমাদের উপর অত্যাচার হয়। তিনি যদি আমাদের কাহিনীগুলো ডকুমেন্ট না করতেন, হয়তো সেগুলো হারিয়ে যেতো বা বিশ্ববাসীর কাছে অজ্ঞাত থেকে যেতো।

মি: চাকমা আরও বলেন, তাঁর ডকুমেন্টগুলো কোয়ালিটি অব ডকুমেন্টেশন, যা বলার মত নয়। তিনি এমনভাবে ডকুমেন্ট করেন, ভিকটিমদের বয়স থেকে শুরু করে গ্রাম, কার মেয়ে, কার ছেলে, সবগুলোই তিনি ডকুমেন্ট করে রাখতেন। আমি বলবো, তিনি যে ডকুমেন্টগুলো দিয়ে গেছেন সেগুলো আমাদের জাতীয় সম্পদ। এগুলোর দরকার আছে একারণে যে, আমরা যদি বাইরে থেকে সহানুভূতি পেতে চাই, এ ডকুমেন্টগুলো আমাদের খুব কাজ দেবে ভবিষ্যতে। যেমন ইহুদীরা যেহেতু দেখাতে পেরেছেন হিটলার তাদের মেরেছে, তাই ১৯৪৮ সালে যখন ইসরাইল রাষ্ট্র গঠন করেছে তখন বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র তাদের পক্ষে ছিল। যে কারণে তারা ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আমরাও হয়ত রামেন্দু বাবুর এইসব ডকুমেন্টের কারণে বহির্বিশ্ব থেকে সহানুভূতি অর্জন করতে পারবো।

তিনি বলেন, আরেকটি অবদানের কথা আমার খুব মনে পড়ে। যখন নাকি চেঙ্গি ভ্যালী প্রজেক্ট হচ্ছিল, তখন অস্ট্রেলিয়া সরকার রাঙ্গামাটি হতে খাগড়াছড়ি, দিঘীনালার দিকে একটি তিন/চার লেনের মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প উদ্বোধন করে। সেটা যদি হতো তাহলে আমাদের পাহাড়িদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হতো। তিনি অস্ট্রেলিয়া সরকারকে চিঠি লিখে সেই প্রজেক্টটি বন্ধ করে দেন। বাংলাদেশ সরকার জুম্মদের আরও অনেক জায়গা বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করতে চেয়েছিল, যেটা হলে জুম্মরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হতো, অনেকে ভূমি হারাতো, উচ্ছেদ হতো। সেটাও তিনি চিঠি লিখে বন্ধ করে দেন।

তিনি আরও বলেন, তাঁর আরও অনেক অবদান আছে। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, সার্ভাইভাল ইন্টারন্যাশনাল, জাতিসংঘ, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে তিনি বক্তৃতা দিতেন। কোরিয়ায় গিয়ে তিনি বক্তৃতা দিতেন আমাদের পক্ষে, ইত্যাদি বহু দলিল রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে যখন তিনি কথা বলতেন, তখন তাঁর কথা থামে না। তিনি অনেককিছু বলতে চাইতেন। আমাদের তাঁর দলিলগুলো সংরক্ষণ করতে হবে। তাঁর যে স্বপ্ন, সেটা যেন আমরা পরিপূর্ণ করতে পারি তার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

কুলোত্তম চাকমা আরও বলেন, হোচিমিনের সাথে তাঁর অনেক মিল দেখি। হোচিমিনও ২৫ বছর বয়সে ভিয়েতনাম থেকে ফ্রান্সে যান। ভিয়েতনামের পক্ষে কাজ করার জন্য। আমাদের রামেন্দু বাবুও যখন আমাদের দেশ থেকে বাইরে যান তখন ১৯৬৭-৬৮ সাল তাঁর বয়স হয়তো তখন বড়জোর ৩০ বছর। এরপর ৫০ বছর ধরে তিনি আমাদের পক্ষে কাজ করে যান। তিনি আর কোনদিন দেশে ফিরেননি। তবে হোচিমিন দেশে ফেরেন ৩০ বছর পর। দেশে ফিরে তাঁর যে স্বপ্ন ভিয়েতনামকে মুক্ত করার, তাঁর জীবিতাবস্থায় সেই স্বপ্নের মাত্র অর্ধেক অর্থাৎ নর্থ ভিয়েতনাম উদ্ধার করেন। যখন তিনি মারা যান তখন ১৯৬৭ সাল, তাঁর মৃত্যুর ৭ বছর পরই ১৯৭৫ সালে ভিয়েতনামিরা ভিয়েতনাম উদ্ধার করতে সক্ষম হন।

ড. আর এস দেওয়ান জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়ার পরামর্শ দিতেন: প্রফেসর মংসানু চৌধুরী

প্রফেসর মংসানু চৌধুরী বলেন, আমি যতদূর স্মরণ করতে পারি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে তাঁকে এক/দুইবার দেখেছি। তিনি প্রায়ই আমাদের জুম্ম ছাত্রদের পড়ার জন্য পরামর্শ ও উৎসাহ দিতেন। শুধু পাশের জন্য পড়া নয়, তিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়ার পরামর্শ দিতেন।

তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে যারা কাজ করেছেন তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে অগ্রগামী। কী পরিমাণ কমিটমেন্ট থাকলে এটা সম্ভব তা তিনিই একমাত্র উদাহরণ। তিনি জুম্মদের মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন এবং বিশ্বাস করতেন।

মংসানু চৌধুরী আরও বলেন, নির্বাসিত অবস্থায় আমৃত্যু তিনি যে জাতীয় অধিকারের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন, জীবন দিয়েছেন, তাঁর জন্য আর কোথাও অনুষ্ঠান করা হয়েছে কিনা জানি না। যারা আমাদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন তাদের তালিকা আছে কিনা জানি না।

‘এক আচানক রাজপুত্র’- নিরঞ্জন চাকমার কবিতা

ভারতের ত্রিপুরা থেকে বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক নিরঞ্জন চাকমা ড. আর এস দেওয়ানের উপর সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ শেষে ‘এক আচানক রাজপুত্র’ নামে নিম্নোক্ত চাকমা কবিতাটি পাঠ করেন:

দেঘা নেই, শুনো নেই, জানা নেই-আবাধা গরি লন্ডন ইউনিভার্সিটির কুইন এলিজাবেথ কলেজর শিঙোর ফুরি উধি এল এক আচানক রাজপুত্র রামেন্দু শেখর দেবান: সনারতুক মাধাত দি, ধল ঘরা পিদিত চড়ি, হাদত দেবা ঝিমিলানি সান এক্কান চিমচিম্যে হিরিচ হলেব দোকদোক্যে আগুন রাঙা ইক্ক্য কলম। তে এক্কুপ মারি আগাজত লিঘি দিলঅ- রানি এলিজাবেথরে। ‘তুই আমার হিল চাদিগাঙ দেশ্চান বেইনজেবে আ বলাজুড়ে কারি লোইয়োচ। তুমি ফিরিবার অক্তত আমারে আমা দেশ্চান হধেহৎ ফিরেই ন দি কিখেই সিয়েন কাজর কুলুকমন একদাঘি অভন্ড মানুজর আহদত গোজেইদি গেলে?’

ইত্তুক আহমক হোই রানি এলিজাবেথ নিগুচ নরম র মেলি কলহ, ‘তুমি মরে মাপ গচ্চ্য, সেই গল্লখান ইক্কিনে সুধুরেবার নয়। ভ-ভাক্কা নেই। সেই অক্তত আঘাত্যে এক দেবা পেরাগত রাঙামাত্যা রণখলা ছিধি গেল ইউরোপ-আমেরিকার রাজপধত। আহ আমা রাজপুত্র রামেন্দু শেখর দেবান অগমানে ধলঘড়া পিধিত্তুন লামি এল লন্ডনর রাজপধত, আহ সিত্তুন ধরি তে যুদ্ধর নাঙে কলম ইক্ক্য ধরি আহদি বেড়েল লন্ডন, ইউরোপ- আমেরিকার পধে পধে। তে তার সুগোর সংসার হেভাদি গোজেন বুদ্ধর সান জিঙহানির তিরোচ-নাল নাদিনেই চাঙমা জাদর তপ্পেত্তুন জনমান পিত্থিমীর রাজপধত নিরেল কীজেক সারি গেল - কীজেক সারি গেল- কীজেক সারি গেল জীংহানি থুম হয় সং।

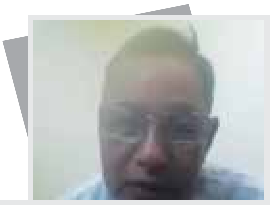

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্নেহ কুমার চাকমা ও আর এস দেওয়ানের ভূমিকা অগ্রগণ্য: গৌতম কুমার চাকমা

গৌতম কুমার চাকমা বলেন, ১৯৩২ সালের জানুয়ারি মাসে যে সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন তখন কিন্তু বিশ্বব্যাপী একটা অর্থনৈতিক মন্দা চলছিল। এরপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হয়। এর পরপর দেশভাগ হয়। দেশভাগের পর পাকিস্তান আমলের যে নানা নির্যাতন-নিপীড়ন এসব তিনি প্রত্যক্ষ করেন। আর অপরদিকে যখন পড়াশোনা করেন তখন আমাদের প্রয়াত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এবং বর্তমান নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার পিতা চিত্ত কিশোর চাকমা তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন, যিনি তাঁকে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেননি, রাজনৈতিক বিষয়েও দীক্ষা দেন বলে জানা যায়, যে কারণে ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত ছিলেন। এসব কারণেই আসলে আমাদের রামেন্দু শেখর দেওয়ান লন্ডন গমন করেন। তিনি সেখানে যান মূলত জুম্ম জনগণের অধিকারের পক্ষে কাজ করার জন্য।

মি: চাকমা আরও বলেন, ১৯৭৪ সালে যখন এম এন লারমা কমনওয়েলথ সম্মেলনে লন্ডনে যান, তিনি এম এন লারমা তার সাথে দেখা করেন। এম এন লারমা তাঁকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য কাজ করতে অনুরোধ করেন। সেই অনুযায়ী তিনি কাজ করেন। তিনি ছিলেন এক সংগ্রামী সাধক।

আমরা ত্রিপুরায় আরও একজন মানুষকে দেখি যাঁর নাম স্নেহ কুমার চাকমা, দেশভাগের সময় যদি তিনি ভারতে না যেতেন তাহলে পরবর্তীতে অনেক ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামে হতে পারতো। পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনে এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আসার ক্ষেত্রেও তিনি ভূমিকা রাখেন। অপরদিকে ইউরোপ জুড়ে ছিল আর এস দেওয়ানের ভূমিকা। আরও অনেকেই আছেন, অনেক সাধনা করেছেন, তবে এই দুইজনের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।

তিনি বলেন, আর এস দেওয়ান যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করেন, আমি মনেকরি তিনি সফল। আমি মনেকরি, তাঁর সাধনায় তিনি সিদ্ধি লাভ করেছেন। পুরোপুরি না হলেও একটা

পর্যায়ে গিয়ে আমরা যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করতে পেরেছি, এর পেছনে স্নেহ কুমার চাকমা ও ড. আর এস দেওয়ানের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

গৌতম কুমার আরও বলেন, ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ানের মৃত্যুর খবরটি আমাদের কাছে পৌঁছে নান্টু বাবুরা যখন তাঁকে দেখতে যান, তার একদিন পর। এরপর আমার নেতা সন্তু লারমার সাথে দেখা হয়, তিনিও জানান, বিষয়টি সত্য। এখন অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যাপারটি হচ্ছে- যেহেতু অন্যেরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেও বৌদ্ধধর্ম অনুসারে নিজের আত্মীয়-স্বজনদেরও করতে হয়, সেজন্য তাঁর যে আত্মীয়-স্বজন আছেন তারা ইতোমধ্যে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন।

তিনি বলেন, এই স্মরণসভা করার পেছনের কারণ হচ্ছে, এই যে তিনি জীবনটা উৎসর্গ করলেন, এই যে তিনি সাধনা করে গেছেন, এখান থেকে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যাতে তাঁকে স্মরণ করতে পারে এবং সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের আন্দোলনে যাতে তারা উজ্জীবিত হতে পারে। তাঁর দলিলগুলো নিয়ে আর্কাইভ করা যায়, যেটা রাজাবাবুও তুলে ধরেছেন। আরেকটি হচ্ছে, তাঁর একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা যায় কিনা। বাংলা-ইংরেজি উভয় ভাষার লেখা নিয়ে যদি স্মারকগ্রন্থ বের করা যায় তাহলে বোধ হয় ভালো হয়। তিনি বলেন, আর শুধু রামেন্দু শেখর দেওয়ান বলে নয়, অন্যান্য যারাই অবদান রেখেছেন তাদের স্মৃতিগুলি ধরে রাখার জন্য তথ্যগুলো সংরক্ষণ করা যায় কিনা তার উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়, যাতে পরবর্তী প্রজন্ম যুগ যুগ ধরে স্মরণ করতে পারে। সেইজন্য লাইব্রেরি, জাদুঘর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা যায়। তবে আমি বলতে পারি, আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে এটা করার মত পরিস্থিতি নেই।

গৌতম কুমার চাকমা বলেন, এই যে রামেন্দু শেখর দেওয়ান মারা গেলেন, তিনি জনসংহতি সমিতির স্পোকসম্যান হিসেবে ইউরোপে কাজ করেন। সতরাং সে হিসেবে জনসংহতি সমিতির একটি দায়িত্ব বর্তায় তাঁর স্মরণে কোনো অনুষ্ঠান করার, তাঁর উদ্দেশ্যে স্মরণ সভা করার। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে এমন একটা পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির শুধু কেন্দ্রীয় কার্যালয় নয়, জেলা পর্যায়ের কার্যালয়, ইউনিয়ন পর্যায়ের কার্যালয় ইত্যাদি সব বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ প্রত্যেকের পেছনে একের পর এক মামলা। মামলার কারণে সবাই এখন ফেরারি। যে কারণে জনসংহতি সমিতি কোনো অনুষ্ঠান আয়োজন করলেও বিপদ হওয়ার পরিস্থিতি এখনও কেটে যায়নি। কিছুদিন আগেও জনসংহতি সমিতির সভাপতির সাথে দেখা হয়। তিনি কোনো অনুষ্ঠান করার বিষয়ে বলেন, এখন তো পরিস্থিতি খুবই প্রতিকূল। আমিও অনুষ্ঠান করার ব্যাপারে বলতে চাই, পরিস্থিতি খুব খারাপ। এবিষয়ে যদি কোনো ত্রুটিও হয়ে থাকে আমি সবার কাছে অনুরোধ জানাবো, যাতে তারা বিষয়টি বিবেচনায় রাখে। তিনি বলেন, আদিত্য বাবু (ড. আদিত্য কুমার দেওয়ান) কমিটি গঠনের কথা বলেছেন, সেটা ভালো প্রস্তাব। আজকে হয়ত সেটা সম্ভব নয়। তবে প্রধীর বাবু, প্রীতিবিন্দু বাবু ও কুলোত্তম বাবুকে এব্যাপারে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

গৌতম কুমার চাকমা আরও বলেন, রামেন্দু শেখর দেওয়ানের যে সাধনা সেটা যেন বরবাদ হয়ে না যায়। এখানে ইহুদীদের কথা এসেছে। লিও টলস্টয় একটি কথা বলেছেন, সময় আর ধৈর্য্য হচ্ছে সবচেয়ে বড় যুদ্ধ। সময় না হলে যেমন মায়ের পেট থেকে সন্তান বের হয় না, তেমনি আন্দোলন-সংগ্রামও সফল হয় না। ১৯৯৭ সালে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি হয়েছে এটা একটা সফলতা। এটার বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদেরকে আন্দোলন-সংগ্রামে এগিয়ে যেতে হবে। ভূমি কমিশন আইন হয়েছে ২০০১ সালে, যেটা সংশোধন হতে সময় লেগেছে ১৫ বছর। ২০১৬ সালে তা যথাযথভাবে সংশোধিত হয়। রামেন্দু শেখর দেওয়ানের কাছ থেকে শেখার রয়েছে। তিনি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, সাহসী ছিলেন, দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি একজন খাঁটি জুম্ম জাতীয়তাবাদী ছিলেন।

এমন মানুষের কথা কেবল রূপকথায় শোনা যায়: সমাপনী বক্তব্যে রাজা দেবাশীষ রায়

সমাপনী বক্তব্যে রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায় আরও বলেন, ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ান এমন একজন মানুষ যে ধরনের মানুষের কথা কেবল রূপকথায় শোনা যায়। সেই মানুষটির সকল তথ্য যেন আমরা সংরক্ষণ করতে পারি, যাতে নতুন প্রজন্ম, ভবিষ্যত প্রজন্ম জানতে পারে, যাতে জাতির ভালোর জন্য, সমাজের ভালোর জন্য কাজ করতে পারে। তিনি এমন একজন মানুষের স্মরণে এই স্মরণ সভার আয়োজনের জন্য প্রধীর তালুকদার ও প্রীতিবিন্দু চাকমাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ভার্চুয়াল স্মরণসভা

ড. আর এস দেওয়ানের আত্মত্যাগ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে অনুপ্রেরণা যোগাবে: স্মরণসভায় বক্তারা

২৮ জুলাই ২০২১

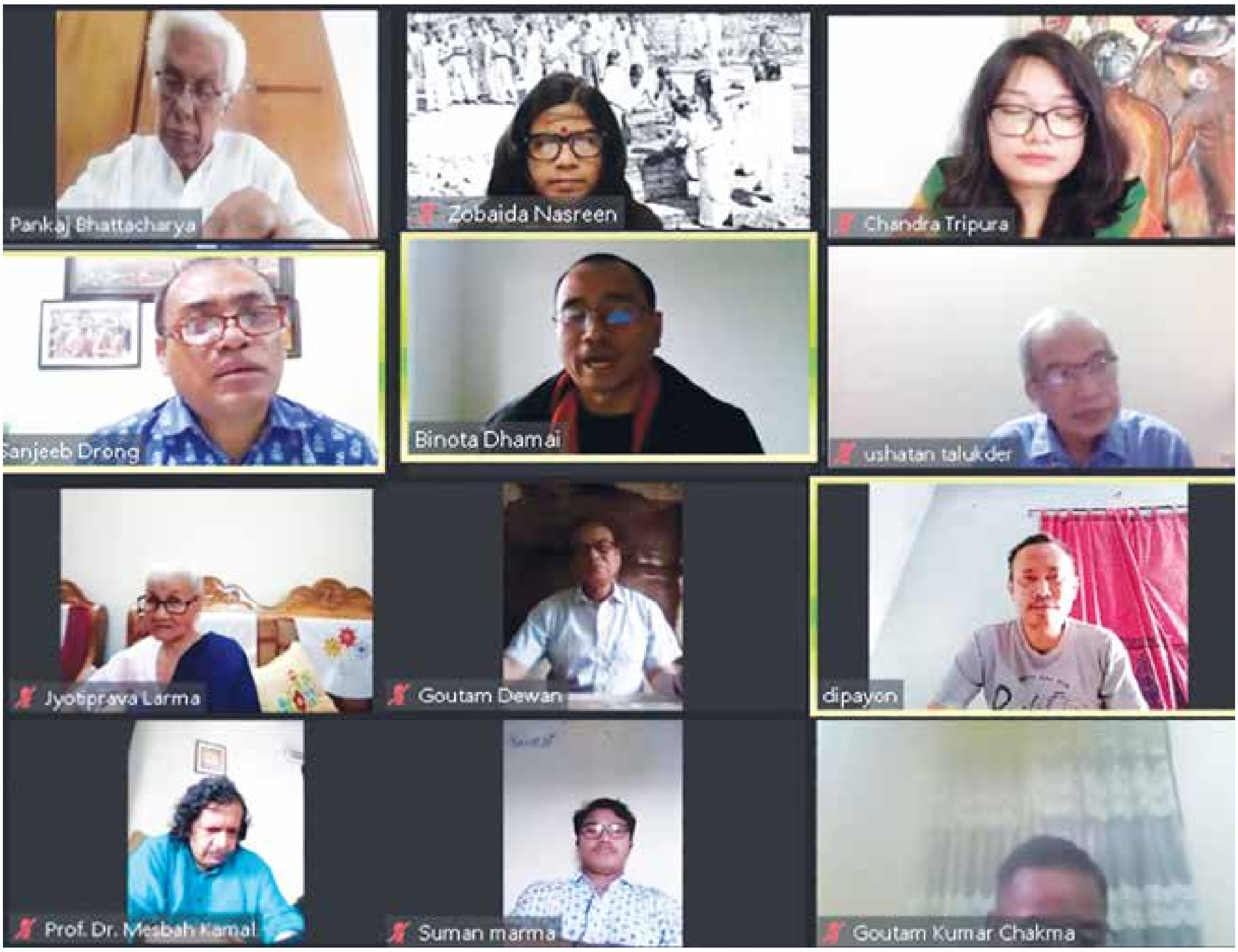
Pankaj Bhattacharya
Zobaida Nasreen
Chandra Tripura
Sanjeeb Drong
Binota Dhamai
ushatan talukder
Jyotiprava Larma
Goutam Dewan
dipayon
Prof. Dr. Mesbah Kamal
Suman marma
Goutam Kumar Chakma

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ানের মহান অবদান ও তাঁর আত্মত্যাগ নিপীড়িত-নির্যাতিত মুক্তিকামী মানুষ আন্দোলন- সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হবে বলে গত ২৮ জুলাই ২০২১ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কর্তৃক আয়োজিত ভার্চুয়াল স্মরণসভায় বক্তারা অভিমত তুলে ধরেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির আন্তর্জাতিক মুখপাত্র ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ান গত ২৯ মার্চ ২০২১ যুক্তরাজ্যের ম্যানচেষ্টারে নিজ এ্যাপার্টমেন্টে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এই মহান বিপ্লবীর মৃত্যুতে তাঁর মহান অবদান ও আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বুধবার ২৮ জুলাই সকাল ১১:০০ ঘটিকা থেকে এক ভার্চুয়াল স্মরণসভার আয়োজন করে জনসংহতি সমিতি।

জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদারের সভাপতিত্বে এবং জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগের সদস্য দীপায়ন খীসার সঞ্চালনায় আলোচক হিসেবে ছিলেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য, আদিবাসী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক সংসদীয় ককাসের সমন্বয়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মেসবাহ কামাল, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ড. জোবাইদা নাসরিন কণা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য গৌতম কুমার চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির সভাপতি গৌতম দেওয়ান এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি সুমন মারমা প্রমুখ। এছাড়াও ড. দেওয়ানকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন

পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সাবেক সভাপতি জ্যোতিপ্রভা লারমা ও তাঁর জীবনী পাঠ করেন বাংলাদেশ আদিবাসী যুব ফোরামের সহ-সভাপতি চন্দ্রা ত্রিপুরা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা'র শোকবার্তা পাঠ করেন দীপায়ন খীসা।

জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) তাঁর শোক বার্তায় বলেন, তাঁর মৃত্যুতে জুম্ম জাতি হারালো এক বিপ্লবী সন্তানকে আর পার্টি হারালো এক আদর্শবান ও নি:স্বার্থ বন্ধুকে। শোক বার্তায় সন্তু লারমা আরো বলেন, তিনি (ড. দেওয়ান) ছিলেন একজন নিখাদ দেশপ্রেমিক, মানবাধিকার সুরক্ষা কর্মী ও দৃঢ়চেতা সংগ্রামী। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির আন্তর্জাতিক মুখপাত্র হিসেবে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের পক্ষে তিনি ছিলেন অটুট মনোবলের অধিকারী একজন অতুলনীয় প্রচার সৈনিক। তাঁর নিরলস প্রচারাভিযানের ফলে যুক্তরাজ্য ও ইউরোপে জুম্ম জনগণের অধিকারের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে উঠে এবং তা ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের অন্যতম সহায়ক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। তাঁর প্রয়াণে যে শুন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা অপূরণীয়।

ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ানের মৃত্যুতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর আত্মীয়বর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতাও জানান জনসংহতি সমিতির প্রধান। এছাড়া জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে ড. আর এস দেওয়ানের মহান অবদান ও তাঁর আত্মত্যাগ জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণ চিরদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে এবং মুক্তিকামী মানুষ আন্দোলন-সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হবে বলেও মনে করেন তিনি।

এদিকে স্মরণসভায় প্রবীণ রাজনীতিবিদ পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন, জনসংহতি সমিতি নেতা উষাতন তালুকদার এবং মঙ্গল কুমার চাকমা ২০১৬ সালে তাঁর সাথে দেখা করার পর যে বিবরণ দিয়েছেন তা দেখে আমি ভাবেছিলাম যে, আমরা একটা দুষ্প্রাপ্য খনি আবিষ্কার করেছি। সেই খনির মধ্যে অনেক মনি মুক্তা আছে। ভোগবাদী সমাজ তাকে ভোগবাদী বানাতে পারেনি। তাঁর সাধক চেতনা ও আদর্শ ক্রমাগত তরুণ প্রজন্মের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাঁর আত্মনিবেদন করা ছিল সবসময় জনগণের জন্য। তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা জুম্ম জনগণের জন্য অমূল্য সম্পদ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের জন্য তিনি 'নেপথ্য নায়ক' বলেও মনে করেন এই প্রবীণ নেতা।

তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের জন্য তিনি সারা বিশ্ব ব্যাপী যে প্রচার অভিযান চালিয়েছিলেন তা কোনোমতেই ছোট করা যাবে না। তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য একটি স্মারক গ্রন্থ এবং সচিত্র চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য তরুণ প্রজন্মের কাছে আহ্বানও জানান। যে জীবন নিজের নয়, মানুষের-দশের জন্য যাপন করে গেছেন সে জীবনকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি।

স্মৃতিচারণ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সাবেক সভাপতি জ্যোতিপ্রভা লারমা বলেন, ড. আর এস দেওয়ান সম্পর্কে আমার ছোট মামা। ছোটকালে তিনি আমাদের বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করেন। তিনি খুবই মেধাবী ছিলেন এবং ষষ্ঠ শ্রেণিতে থাকা অবস্থায় তিনি বৃত্তি পেয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যারয়ে পড়াশুনা করার সময় তার সাথে দেখা হত বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে। বিদেশ গমনের পর তাঁর সাথে পত্রবিনিময় হত এবং তিনি তাঁর স্বজাতির মানুষের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

অধ্যাপক মেসবাহ কামাল বলেন, রামেন্দু শেখর দেওয়ানের সাথে আমার একটা অনুষ্ঠানে থাকার সৌভাগ্য হলেও সাক্ষাত পরিচয় হয়নি। মানুষের মানবাধিকারের আন্দোলন একটি বিশ্বজনীন সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে আর এস দেওয়ান অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি আসলে সকল জাতির জন্য বাংলাদেশকে একটি বাসযোগ্য করতে চেয়েছিলেন। সকলের জন্য সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছিলেন। দীর্ঘদিন বিদেশে থেকে তার মনটা যে দেশে পড়েছিল তা তার কাজ থেকে সেটা বুঝা যায়। তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমাকে অনেক গভীরে গিয়ে পড়াশুনা করতে হয়েছে, জানতে হয়েছে। এই গবেষণা করতে যেয়ে দেখেছি পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে আন্তর্জাতিক সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের সর্বাগ্রে বার বার আমি পেয়েছি ড. আর এস দেওয়ানের কথা।

তিনি আরো বলেন, পাহাড়ের পরিস্থিতিকে যখন অনুধাবন করা হচ্ছে না, সেই ১৯৭২ সালে সংবিধানে যখন স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে না, তা নিয়ে পাহাড়ের নেতারা তখন প্রেস কনফারেন্স করতে চেয়েছিলেন। তখন সেই প্রেস কনফারেন্স করতে দেয়া হয়নি। সেসময় পাহাড়ের নেতারা টাঙ্গাইলে মজলুম জননেতা মাওলানা ভাষানীর সাথে দেখা করতে যান। সেখানে মাওলানা ভাষানী বলেছিলেন, দেশে যখন তোমাদের কথা শোনা হচ্ছে না, তোমরা বিলেতে গিয়ে আন্তর্জাতিক সংযোগ গড়ে তুলে আন্দোলন সংগঠিত করো। সেই ভাবনা ড. আর এস দেওয়ানের ছিল। কেবল ইউরোপ নয়, পৃথিবীর বহু দেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে ক্যাম্পেইন গড়ে তোলার কাজটি সমন্বিত করার কাজটি করেছিলেন এই ড. দেওয়ান। তিনি একটা বিশ্বজনীন ক্যাম্পেইনের প্রধান মুখপাত্র এবং তিনি লড়াই করেছিলেন মানুষের অধিকারের জন্য।

তিনি আরো বলেন, পাহাড়ের মানুষ তো আকাশের চাঁদ চাননি। তারা চেয়েছিলেন বৈচিত্রের স্বীকৃতি। এই বৈচিত্র্যের

মধ্যে যে ঐক্যতান তার স্বীকৃতির কথা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলেছিলেন, সন্তু লারমা বলছেন এবং ড. আর এস দেওয়ানও বলে গেছেন। এই একবিংশ শতাব্দীতে এই স্বীকৃতি না দেওয়া মানে বাংলাদেশকে পিছিয়ে দেয়া বলেও মনে করেন তিনি। একটা বিশাল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং একটা সময় গিয়ে নিশ্চয় পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য ও আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য গৌতম কুমার চাকমা বলেন, তিনি জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাধক। দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে বিশ্বাসী এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় আশাবাদী মানুষ। তিনি ব্রিটেনের মত দেশে থেকেও কোনো ধরনের হিটার ছিল না, রান্নার ব্যবস্থাও ছিল না। শেষ বয়সে তিনি বৈদ্যুতিক লাইন কেটে স্ট্রিট লাইট নিয়ে চলতেন। এমনি একটা পরিস্থিতিতে তিনি আসলেই কৃচ্ছ্র সাধন করেছেন। তিনি আসলেই কিছুই নেননি। ব্রিটিশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা নিয়ে কেবল দিয়ে গেছেন। তাঁর কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছুই শেখার আছে। স্নেহ কুমার চাকমা, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এবং ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ান বলেন সবাই কেবল দিয়েই গেছেন। তাদের সংগ্রাম ও ত্যাগ কিছুতেই বৃথা যায়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির সভাপতি গৌতম দেওয়ান বলেন, আমরা এক মহান ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করছি। আমাদের কাছে তিনি এক কিংবদন্তী তুল্য। তাঁকে দেখার সৌভাগ্য না হলেও তাঁকে নিয়ে অনেক কিছুই জেনেছি। আমরা এমন সময়ে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করছি যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম একটা ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। আমরা বলি, আমাদের অধিকার আন্দোলনের জন্য যে মূল্যবোধ ও দৃঢ়তা থাকা দরকার সেটাতে আমরা শৈথিল্য দেখতে পাচ্ছি। ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ান জনসংহতি সমিতির আন্তর্জাতিক মুখপাত্র কেবল নয়, তিনি আমাদের পাহাড়ের দূত ছিলেন। আমাদের সমস্যাগুলোকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তুলে ধরার কাজটি তিনি করে গেছেন। এখন অনেকেই এই কাজটি করছেন, কিন্তু এই পথ দেখানোর কাজটিই প্রথম করে গেছেন ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ান। তাঁকে সম্মান জানাতে হলে তাঁর অসমাপ্ত কাজগুলো করে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হবে এবং আন্দোলনকে দুর্বার গতিতে চালিয়ে নিতে হবে বলে মনে করেন তিনি।

সঞ্জীব দ্রং বলেন, ড. দেওয়ানের সাথে আমার দেখা হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। অনেকের থেকে কাছ জানলাম যে তিনি অদ্ভুত মেধাবী ছিলেন। অনেকের মধ্যে দেশপ্রেম থাকতে পারেন। কিন্তু তাঁর মত মেধা অনেকের নেই। কাজেই তিনি সেই মেধাকে তাঁর জনগণের জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন। পাহাড়ের জীবন সংগ্রামের কথাগুলো লিখে যাওয়ার জন্য তিনি তরুণ ও প্রবীণ নেতাদেরও লেখার আহ্বান জানান তিনি। যারা দেশে-বিদেশে পাহাড়ের মানুষের অধিকারের জন্য লড়াই করছেন, কাজ করছেন তাদেরকে যুক্ত করতে হবে। ড. আর এস দেওয়ানকে নিয়ে আরো অনেক বেশি লেখালেখি হওয়া প্রয়োজন যা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবেন বলেও মনে করেন তিনি।

ঢাবি শিক্ষক ড. জোবাইদা নাসরিন বলেন, সেই খবংপয্যে থেকে সালফোর্ড। এই জীবনকে যদি দেখতে চাই তাহলে আমরা কিছু শাণিত দিক দেখতে পাই। জন ইতিহাসে আমরা দেখেতে পাই অনেক মানুষ নিজেকে লাইম লাইটে রাখতে চাননা। কিন্তু আসলে তারাই ইতিহাসে স্থান করে নিয়ে থাকেন। পাহাড়ে যারা শিক্ষা বিস্তারে অবদান রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে রাঙ্গামাটির মাওরুম গ্রামের 'লারমা পরিবারের' একটা অবদান আমরা দেখতে পাই। পাহাড়ের বিভিন্ন অজপাড়াগায়ে যারা পড়ছিলেন তাদেরকেও তারা অনুপ্রাণিত করেছিলেন। চিত্তকিশোর চাকমাই এই ড. দেওয়ানকে তিনি তাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। কাজেই মাওরুম গ্রামের যে অবদান সেটাও লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

তিনি আরো বলেন, তিনি যে দেশের বাইরে গিয়েছিলেন তাঁর একটা গুঢ় উদ্দেশ্য ছিল। সেটা হলো পাহাড়ের পরিস্থিতিকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তুলে ধরা। যেটা সে সময়ে খুবই প্রয়োজন ছিল। জুম্ম জনগণের স্বাধিকারের জন্য তিনি আজীবন প্রচার চালিয়ে ছিলেন। রামেন্দু শেখর দেওয়ান যে জীবনযাপন করেছিলেন তা পুরো লড়াইয়ে তিনি প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছিলেন।

লন্ডনে পিএইচডি থিসিসের কাজে গিয়ে ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ানের সাথে দেখা হওয়ার স্মৃতি তুলে ধরে ড. জোবাইদা নাসরিন আরো বলেন, মানুষ তার জীবনে অনেক কিছু চায়। ঐশ্বর্য, ক্ষমতা, সম্পদসহ অনেক কিছু চায়। কিন্তু এসবকে পেছনে ফেলে রাজনৈতিক দর্শনকে ধারণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে সাদা-মাটা জীবন গ্রহণ করা এই ক্ষণজন্মা এই মহান ব্যক্তি পাহাড়ের মানুষের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি সুমন মারমা বলেন, জনসংহতি সমিতির আদর্শকে ধারণ করে তিনি যে আজীবন আন্তর্জাতিক মহলে প্রচার কার্য চালিয়ে গেছেন সেটাকে আমরা তরুণরা সম্মান ও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। পাকিস্তান জমানায় বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. খুদরত-ই-খুদার অধীনে চাকরি করার সময় তিনি যে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন এবং ডিবি কর্তৃক যে

হেনস্তা এবং জীবন হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন তার একই চিত্র এখনো পাহাড়ে বিরাজ করছে। এখনো পর্যন্ত শাসকগোষ্ঠী আমাদের ন্যূনতম রাজনৈতিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়নি। করোনা মহামারীর মধ্যেও জুম্ম জনগণ, নিরীহ কৃষক ও ছাত্র সমাজের উপর শাসকগোষ্ঠীর নানা ধরনের নিপীড়ন আমরা লক্ষ করেছি। এমনি বাস্তবতায় আমরা তরুণ ছাত্র-যুব সমাজ ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ানকে অনুপ্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। ছাত্র জীবন থেকে তিনি যে আদর্শকে ধারণ করে আজীবন জুম্ম জনমানুষের জন্য লড়ে গেছেন তার জন্য আমরা তাঁকে পাঠ করতে পারি।

সভাপতির বক্তব্যে জনসংহতির সহ-সভাপতি ও সাবেক সাংসদ ঊষাতন তালুকদার বলেন, ড. দেওয়ানের ডাকনাম কুলকুসুম। কুল হল গোষ্ঠী, কুসুম মানে প্রস্ফুটিত পুষ্প। এই পুষ্পের সুবাস তিনি সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়েছেন। পাশ্চাত্য জীবনের হাতছানি থেকে ছাড়িয়ে কেবল কৃচ্ছ্রতা সাধন করে, সরকারের ভাতা নিয়েই জীবনকে ধারণ করেছেন। তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা এবং আজীবন অবিচল ও সংকল্পবদ্ধ। একাগ্র চিত্রে মনেপ্রাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের জন্য কাজ করে গেছেন। তাঁর আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

শ্রী তালুকদার আরো বলেন, একটা কথা আছে 'আউট অব সাইট, আউট অব মাইন্ড'। কিন্তু হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ান তাঁর স্বজাতিকে ভুলেন নাই। তাঁর স্বজাতির মানুষরা যেন স্বাধিকার পায় তার জন্য সারা জীবন কাজ করে গেছেন এই নিভৃতচারী প্রচার সৈনিক ড. দেওয়ান। তাঁর রেখে যাওয়া ডকুমেন্টগুলো পার্টির তরফ থেকে দায়িত্ব নিয়ে সংগ্রহ করা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। তাঁর পাণ্ডুলিপিগুলো সংরক্ষণ করে আগামীর গবেষকদের জন্য কাজে লাগবে বলেও মনে করেন তিনি। পার্বত্য চুক্তি হয়েছে, কিন্তু এখনো সেটা বাস্তবায়িত হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে হলে এই চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারকে বাধ্য করতে হবে এবং ড. আর এস দেওয়ানের মত নি:স্বার্থভাবে আমরণ কাজ করে যেতে হবে এবং এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে রামেন্দু শেখর দেওয়ানের স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে।

এছাড়া উক্ত আয়োজনে আরো বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় স্টাফ সদস্য চঞ্চনা চাকমা, জাতিসংঘের এমরিপ কাউন্সিলের সহ-সভাপতি বিনোতাময় ধামাই ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সহ সাধারণ সম্পাদক পল্লব চাকমা প্রমুখ।

ড. আর এস দেওয়ান ১৭ জানুয়ারি ১৯৩২ সালে বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলা সদরে খবংপয্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিষ্ট্রিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করার পর উচ্চতর পড়াশুনার জন্য ১৯৬৭ সালে ৩রা নভেম্বর যুক্তরাজ্যে পাড়ি দেন। এরপর লন্ডনস্থ কুইন্স এলিজাবেথ কলেজ থেকে এমফিল এবং ১৯৮০ সালে সালফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। অধ্যয়নের পাশাপাশি তিনি ১৯৭০ দশক থেকে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের পক্ষে প্রচার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন যা ক্লান্তিহীনভাবে আমরণ চালিয়ে যান।

ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ানের স্মরণে আন্তর্জাতিক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা

১২ আগস্ট ২০২১

ড. আর এস দেওয়ানের আত্মত্যাগ: পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার

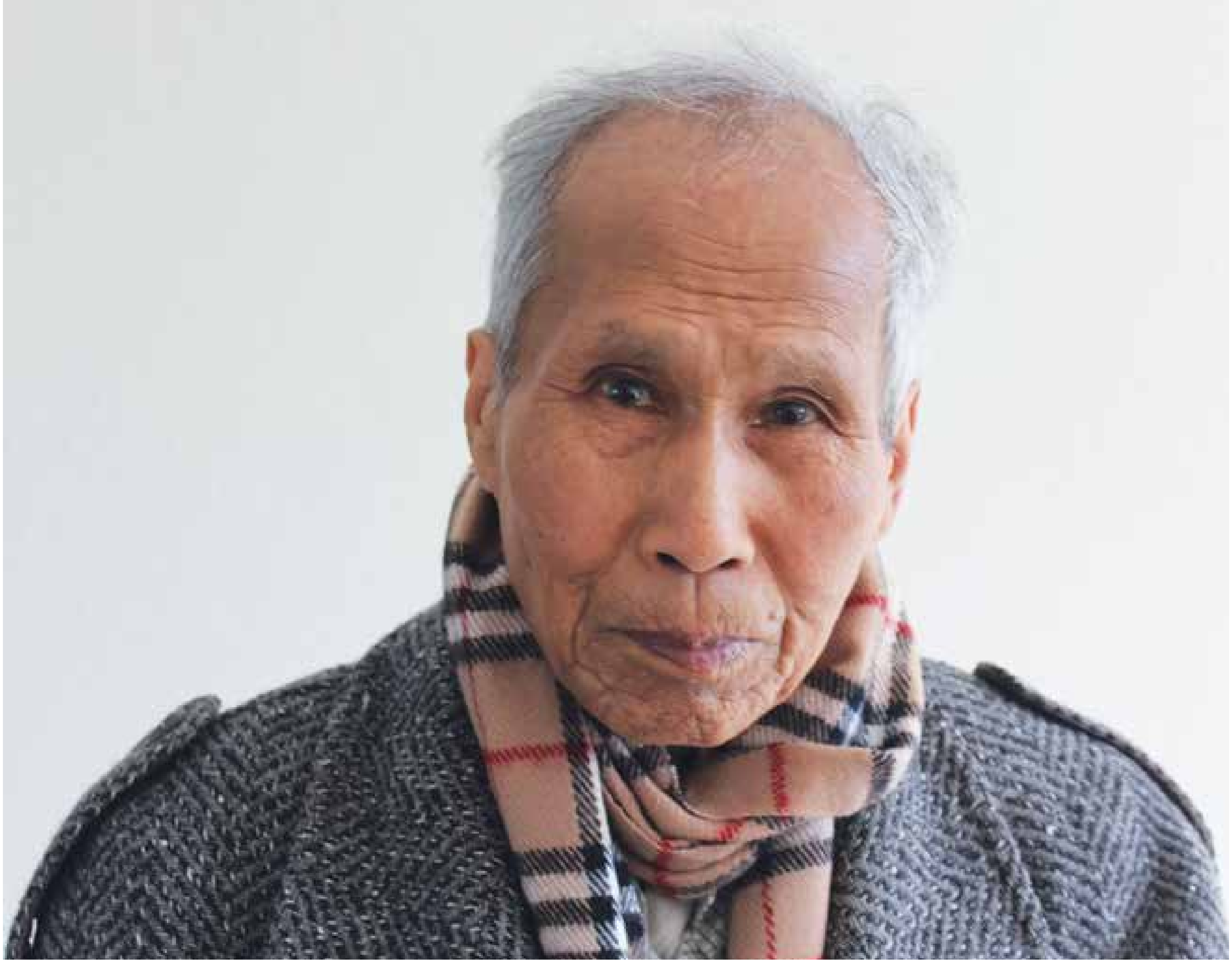

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলনে ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ানের (আর এস দেওয়ান) ত্যাগ-তিতীক্ষা ও আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে 'ড. আর এস দেওয়ানের আত্মত্যাগ: পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার' শিরোনামে ড. আর এস দেওয়ানের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনের পক্ষে প্রচারাভিযানে ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে যারা ছিলেন এবং আন্তর্জাতিকভাবে অংশগ্রহণকারীদের সমন্বয়ে ১২ আগস্ট ২০২১ রবিবার বাংলাদেশ সময় বিকাল ৬:৩০ টায় এক আন্তর্জাতিক জুম ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। চন্দ্রা কালিন্দী রায়-হেনরিকসেন এ আলোচনা সভার সঞ্চালনা করেন।

অংশগ্রহণকারী আলোচকবৃন্দ:

প্রীতিবিন্দু চাকমা, মানবাধিকার কর্মী, কানাডা

ড. আদিত্য কুমার দেওয়ান, প্রফেসর, কনকোডিয়া ইউনিভার্সিটি, কানাডা

ড. উল্ফগ্যাং মে, এথনোলজিক্যাল মিউজিয়াম, হামবুর্গ ও সহ প্রতিষ্ঠাতা, পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন

জেনেকে এ্যারেন্স, সহ প্রতিষ্ঠাতা, পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন, বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন বইয়ের লেখক

এলসা স্ট্যামেটোপৌলৌ, কো-চেয়ার, পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন ও প্রফেসর, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, নিউইয়র্ক

সোফি গ্রিগ, সার্ভাইভ্যাল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন

ইয়ান রিগুার্স, সিনিয়র কনসালটেন্ট ফর জেণ্ডার জাস্টিস, এংগেজিং মেন, জিবিভি পিভেন্সন, এসআরএইচআর এণ্ড সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট, নেদারল্যাণ্ডস

শিবাশীষ রায় বান্টিং, পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার কর্মী, জুম্ম পিপলস নেটওয়ার্ক, লন্ডন

বিনতাময় ধামাই, পিএইচডি ছাত্র, অস্ট্রেলিয়া এবং বিশেষজ্ঞ সদস্য, আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কর্মব্যবস্থা (এমরিপ)

লিমোনা চাঙা, নারী অধিকার ও উন্নয়ন কর্মী, লন্ডন

ড. মেসবাহ কামাল, প্রফেসর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গৌতম কুমার চাকমা, কেন্দ্রীয় সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

প্রধীর তালুকদার রেগা, অধিকার কর্মী, ভারত।

এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ানের স্মরণে আন্তর্জাতিক ভার্চুয়াল আলোচনা সভার কার্যসূচি শুরু হয়। ড. আর এস দেওয়ানের আত্মত্যাগের উপর প্রীতিবিন্দু চাকমার সূচনা বক্তব্য দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়। আলোচনা সভার আলোচকদের বক্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হল।

প্রীতিবিন্দু চাকমার সূচনা বক্তব্য:

নিখাঁদ দেশপ্রেমিক এবং অতুলনীয় প্রচার সৈনিক, ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার নিবাসী ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ান গত ২৯ মার্চ ২০২১ তারিখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর প্রয়াণে জুম্ম জনগণ হারিয়েছেন তাদের এক বিপ্লবী সন্তান এবং আন্তর্জাতিক শুভাকাঙ্ক্ষী ও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচারাভিযান কর্মীরা হারিয়েছেন এক আদর্শবান এবং নিঃস্বার্থ বন্ধুকে।

তিনি এমফিল এবং পিএইচডি ডিগ্রী সম্পন্ন করার পর কিছু সময়ের জন্য চাকরি করেন এবং তারপর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির আন্তর্জাতিক মূখপাত্র হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের পক্ষে প্রচার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৯৭০ দশকের শুরু থেকে বিশেষত জাতিসংঘসহ ইউরোপ ও সারা বিশ্বে প্রচারণা কার্য চালান। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি সংক্রান্ত দলিল বিভিন্ন মানবাধিকার সুরক্ষাকর্মী ও সংগঠনের কাছে নিয়মিতভাবে পাঠাতেন।

সত্তর-আশি দশকের দিনগুলোতে সরকার সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামকে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকে লুকিয়ে আদিবাসী জুম্ম জনগণের উপর ফ্যাসিবাদী নির্যাতন চালাচ্ছিল। সেসময় ড. আর এস দেওয়ানই ছিলেন সেই অগ্রপথিক যিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়টি আন্তর্জাতিক দরবারে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি উম্মোচিত করেন। এন্টিস্লেভারী সোসাইটি, সার্ভাইভাল ইন্টারন্যাশনাল, কোয়েকার পীস সার্ভিস, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, অর্গ্যানাইজিং কমিটি অন সিএইচটি ক্যাম্পেইন, ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ক গ্রুপ অন ইণ্ডিজিনাস এ্যাফেয়ার্স এবং আরো অনেক সংস্থার অবিচল সমর্থন ও সহযোগিতায় জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দেলনের অনুকুলে আন্তর্জাতিক অঙ্গণে বলিষ্ট জনমত তৈরি করতে তিনি সক্ষম হন।

ড. আর এস দেওয়ান স্মরণ করেন, তাঁর প্রচারকার্যের শুরুর দিনগুলোতে এন্টিস্লেভারী সোসাইটির মানবাধিকার কর্মী পিটার ডেভিস এবং বৃটিশ পার্লামেন্টের লর্ডসভার সদস্য তথা পার্লামেন্টারী মানবাধিকার কমিটির চেয়ারম্যান লর্ড এ্যাভেবুরী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সাহায্যের কথা, যাঁদের সহায়তা ব্যতিরেকে আন্তর্জাতিক প্রচারনার কাজ শুরু করা সুকঠিন ছিল। সেসময়

বিশেষত এন্টিস্লেভারী সোসাইটি, সার্ভাইভাল ইন্টারন্যাশনাল, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, ইবগিয়া প্রভৃতি সংস্থা জুম্ম জনগণের উপর চলমান পৈশাচিক নির্যাতনের উপর নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করতো।

১৯৮৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আর্মস্টাডাম-এ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত একটি কমিশন গঠনের জন্য উপরোক্ত মানবাধিকার সংস্থাসমূহ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আন্তর্জাতিক বন্ধুবর্গ যেমন- ডেনমার্ক থেকে ইবগিয়ার ড. টেরেসা এপারিসিও, জার্মানির উল্ফগ্যাং মে, যুক্তরাজ্য থেকে এন্ড্রু গ্রে, নেদারল্যান্ডস থেকে জেনেকে এরেন্স এবং জুম্ম প্রতিনিধিবৃন্দসহ ড. আর এস দেওয়ানের উপস্থাপিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবানুসারে ১৯৮৯ সালে আন্তর্জাতিক পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে ড. আর এস দেওয়ানের অবদান ছিল সবেচেয়ে অগ্রগণ্য। ১৯৯০ দশকে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামসহ ভারতস্থ জুম্ম শরণার্থী শিবির পরিদর্শন এবং অতঃপর 'জীবন আমাদের জন্য নয়' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ফলে বিশ্ব সম্প্রদায়ের নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামের ভয়ঙ্কর মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্মোচিত হয়েছিল।

ড. আর এস দেওয়ান এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাসমূহের অক্লান্ত প্রচারনাসহ জুম্ম জনগণের অপ্রতিরোধ্য আন্দেলনের মূখে ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার জনসংহতি

সমিতির সাথে ঐতিহাসিক ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি’ স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, বাংলাদেশ সরকার এখনও চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন করেনি এবং চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বর্তমানে কার্যত বন্ধ করে রেখেছে।

ড. আর এস দেওয়ানের একমাত্র স্বপ্ন ছিল জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর স্বপ্ন পূরণ করতে জুম্ম জনগণকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা নিয়ে এখনো অনেক আত্মত্যাগ ও দৃঢ়তার সাথে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

মহান প্রচার সৈনিক ড. আর এস দেওয়ানের অবদান ও আত্মত্যাগের প্রতি আরো একবার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমি এখানেই আমার সূচনা বক্তব্যের উপসংহার টানছি। তাঁর মহান সংগ্রামী প্রত্যয় ও অবদান জুম্ম জনগণের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তথা বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে বিরাজ করুক!

এখন আমি জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ভূতপূর্ব প্রধান, রাজকুমারী চন্দ্রা কালিন্দী রায় হেনরিকসন-এর প্রতি অনুরোধ করছি তিনি যেন স্মরণসভার কার্যক্রম সঞ্চালন করেন। এই বলে আমি চন্দ্রা কালিন্দী রায়কে সভা সঞ্চালনের দায়িত্ব অর্পণ করছি।

রাজকুমারী চন্দ্রা কালিন্দী রায়-হেনরিকসন (সঞ্চালক):

গুড মর্ণিং, গুড আফ্টারনূন, গুড ইভনিং। প্রত্যেককে জু, জু, জু। প্রথমেই বলি যে, আপনাদের সবাইকে দেখে আমার বেশ ভালো লাগছে। দুর্ভাগ্যবশত এটা হচ্ছে একটা শোকবহ ঘটনা যা কিছুদিন আগে ঘটে গেছে। ড. দেওয়ান বেঁচে থাকার সময় এ ধরনের সভা আয়োজনের কথা আমিও অনেক আগে ভেবেছিলাম, যদি আয়োজন করতে পারতাম তাহলে তখন হয়তো তাঁকে সাথে করে আমরা তাঁর জীবন উদযাপন করতে পারতাম। যা হোক, কখনো না হওয়ার চাইতে দেরিতে হওয়াটা অনেক ভালো। আমার পক্ষে এটা বিরাট সম্মানের যে, আমাকে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে এবং এই স্মরণসভাটি সঞ্চালনা করতে বলা হয়েছে। আমি জানি যে, এই স্মরণসভায় আপনাদের প্রত্যেকে দুই থেকে ১০ মিনিট করে কথা বলার সুযোগ পাবেন। তবে আপনারা যদি পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মধ্যে বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন তাহলে অন্যরাও কথা বলার সুযোগ পেয়ে যাবেন।

আমরা প্রথমে বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে দিয়েই স্মরণসভা শুরু করতে যাচ্ছি। যেমনটা আপনাদের স্মরণে আছে যে, আমাদের প্রথাগত রেওয়াজ হলো, আমরা সর্বদা বয়োজ্যেষ্ঠদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি আমরা অগাধ সম্মান পোষণ করি, যেহেতু আমি সেই বয়োজ্যেষ্ঠ গ্রুপেরই অংশ, এখানে উপস্থিত থাকতে পারা আমার জন্যও রীতিমতো উৎসাহব্যঞ্জক বলা যায়। আমরা প্রথমে আমাদের আজু ড. আদিত্য কুমার দেওয়ানকে দিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি। আলোচনা শুরু করার জন্য আমরা তাঁকে অনুরোধ করছি। আজু, এখন আপনার বক্তব্য দিয়ে আলোচনা শুরু হল।

ড. আদিত্য কুমার দেওয়ান:

ধন্যবাদ চন্দ্রা। এই স্মরণসভা আয়োজনের জন্য প্রধীর এবং প্রীতিকেও ধন্যবাদ। অবশ্য এধরনের স্মরণসভা চাকমা জুম্মদের নিয়ে আমরা একবার করেছিলাম। এটা মূলত ড. আর এস দেওয়ান-এর কর্ম এবং জীবন নিয়ে দ্বিতীয় বার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা। এটি সত্যি যে, আমরা জুম্ম জনগণের পক্ষে একজন মহান ব্যক্তিকে হারিয়েছি। আমি সব কিছুতে যেতে চাইছি না। তবে আমি সেসবের কিছু বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই। তিনি ছিলেন প্রকৃত পক্ষে অগ্রপথিক যিনি আন্তর্জাতিক স্তরে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কেউ যদি একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকেন; কেউ যদি পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে কিছু লিখতে চান; আমি মনে করি, ড. আর এস দেওয়ানের মহান কর্মকে দিয়েই তাকে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিরোধ আন্দোলনের ইতিহাস শুরু করা উচিত।

আর আমার এখানে উল্লেখ করা উচিত, আপনাদের মধ্যে যারা আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যু নিয়ে জড়িত হতে সচেষ্ট ছিলেন, তাদের মধ্যে জেনেকে, ইয়ান, উল্ফ গ্যাং প্রমুখদের আমি সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম হামবুর্গে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্মেলনে, ১৯৯১ বা ১৯৯০ সালে হবে, প্রকৃত তারিখটা আমার মনে নেই। আমি জেনেকে এবং ইয়ান এর সাথে দেখা করেছিলাম। ড. আর এস দেওয়ানের সাথে সেখানেই আমার দেখা হয়েছিল।

ড. আর এস দেওয়ান মূলত একজন অত্যন্ত বিনয়ী ব্যক্তি। তিনি কাউকে বিরক্ত করতে চাইতেন না। এ কারণে আমরা যখন প্রথম চাকমা ভাষায় স্মরণসভা করছিলাম, তখন কিছু লোক জানতে চেয়েছিলেন কেন আমরা ড. দেওয়ানের প্রয়াণের

ব্যাপারে অনেক দিন পর্যন্ত জানতে পারেনি। প্রকৃত পক্ষে যারা তাঁর সাথে সংযোগ রাখতেন, তারা সহজে যোগাযোগ করতে পারতেন না। কারণ তিনি তাঁর ফোন লাইন এবং অন্যান্য জিনিস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। কারণ তিনি কাউকে বিরক্ত করতে চাইতেন না। এটা একটা দিক ছিল। আর তিনি যদি ইংল্যান্ডে থাকতেন তাহলে তিনি কিভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তা অল্প সময়ের মধ্যে জানতে পারতেন। আর নিরাপত্তা-জনিত এবং অন্যান্য কারণে তাঁর ম্যানচেষ্টারের বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করাও ছিল কঠিন। সুতরাং, ড. দেওয়ানকে কেন যত্ন নেয়া হয়নি বলে কেবল একে অপরে দোষারোপ করার কোন অর্থ হয় না। তিনি আসলে চাইতেন লোকজন থেকে দূরে থাকতে যাতে কেউ তাঁর দ্বারা বিরক্তিবোধ না করেন। বিষয়টা হলো এটাই। এ বিষয়ে আমি আর বিশেষ কিছুটে যাবো না।

মূলত আমি তাঁর মিশন এবং ভিশন সম্পর্কে বলবো। যেমনটা আগে বলেছি, তাঁর মিশন ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রচারাভিযান: পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার। আর ভিশন ছিল আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার, মিশন ছিল প্রচার কার্য চালানো। যদিও তিনি বলতেন না, তবুও তাঁর মিশন ও ভিশনকে আমি তুলনা করছি ড. মার্টিন লুথার কিং-এর সাথে। যখন ড. মার্টিন লুথার যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিলেন, তখন তিনি বলতেন- 'আমার একটা স্বপ্ন আছে।' অনুরূপ ড. দেওয়ানেরও একটা স্বপ্ন ছিল। আর সেই স্বপ্নটা হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার। এটাই আমি বলতে চাই।

সেটা ছিল আন্দোলনের প্রারম্ভিক স্তরে যখন ড. উল্ফগ্যাং মে, জেনেকে এবং ইয়ান প্রমুখ বন্ধুরা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে প্রচারাভিযানে সক্রিয় হয়েছিলেন। চন্দ্রাও সেখানে ছিলেন। আরো একজন ছিলেন, তিনি হলেন জয়তি। আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে যাদের দেখি, যারা নিবেদিত প্রাণ ছিলেন, এখানে একজন আছেন, তিনি হলেন এলসা। আমরা প্রতি বছর জাতিসংঘ সম্মেলনে মিলিত হই। জাতিসংঘে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে ক্যাম্পেইন সংগঠিত করার কাজে এলসা বরাবরই কার্যকর ভূমিকা পালন করতেন। আর পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যেক বিষয়ে, যখন যেখানে যা কিছু ঘটতো, তখন এলসা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের পক্ষে বিবৃতি দিয়ে থাকতেন। বিনতাময়ও থাকতেন। বর্তমানে তিনি অস্ট্রেলিয়াতেই আছেন।

আমি খুব বেশি আর সময় নেবো না। এখানে অনেকে আছেন, তারা কথা বলতে চান, তাদের কথাও আমরা শুনবো। তাই, আপনাদেরকে ধন্যবাদ, প্রত্যেককে ধন্যবাদ। আমি পূরনো বন্ধুদের দেখতে পাচ্ছি। এখানে আবার দেখা হলো, আপনারা সবাই জুম্ম জনগণের বন্ধু, বিশেষত আন্তর্জাতিক বন্ধুরা যারা আমাদেরকে বর্তমানে সাহায্য করছেন বা পূর্বে করেছেন। এই সভায় আবার দেখা হওয়ায় আপনাদের সকলেই প্রতি অনেক অনেক ধন্যবাদ।

সঞ্চালক: ড. আদিত্য দেওয়ান, এই আন্তর্জাতিক সভায় সবকিছু সুন্দরভাবে পরিবেশন করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। প্রকৃতপক্ষে ড. আর এস দেওয়ান পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে কিভাবে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করেছিলেন তা তিনি তুলে ধরেছিলেন। আমি তখন সবে বাইরে যাওয়া শুরু করছিলাম। তখন প্রথম বার আমি জেনেভাস্থ জাতিসংঘে গিয়েছিলাম এবং সেখানে ড. দেওয়ানের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার এবং জাতিসংঘে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গণে কাজ শুরু করার সুযোগ হয়েছিল। যা হোক, আমরা এখন যাবো প্রফেসর ড. উল্ফগ্যাং মে-এর কাছে। ড. মে, এখন আপনার পালা। ফ্লোর বলবো না, বলবো মাইক্রোফোন এখন আপনার। অনুগ্রহ করে আপনি শুরু করুন।

ড. উল্ফগ্যাং মে:

ধন্যবাদ। আচ্ছা, প্রথমে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই আয়োজকদেরকে যারা এই আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার মনে হয়, রামেন্দু বাবুকে যথার্থভাবে স্মরণ করতে হলে, আমরা কেবল এখনই তা করতে পারি। এটা অত্যন্ত মহৎ যে, সেটা আপনারা সম্ভব করেছেন। আমার বক্তব্যটা বরং ব্যক্তিগত বিষয়েই হবে। আর হ্যাঁ, আপনাদের অনেককে দেখে আমি খুবই আনন্দিত। অনেক আগে আপনাদের সাথে আমার দেখা হয়েছে, বিশেষত চন্দ্রার সাথে অনেক আগে। আমরা তখনকার দিনগুলোতে বেশ ইয়ং ছিলাম। আর অন্য সবাই, হল্যাণ্ড থেকে, ইণ্ডিয়া থেকে ও কানাডা থেকে অংশগ্রহণকারী সহকর্মী ও বন্ধুরা, যাদের মধ্যে কয়েক জন আমার কাছে নতুন। আপনাদেরকে দেখে আমি আনন্দিত।

আমি অবশ্যই স্বীকার করি যে, আমি সেরকম একটা ভয়ার্ত দিনের সম্মুখীন হবো। তবে এটা ঠিক যে, আমরা এমন কাউকে হারিয়েছি যিনি অনেক কিছু অর্থবহ ছিলেন এবং আমার কাছে তিনি অনেক অর্থবহ। রামেন্দু বাবুর সাথে প্রথম বার আমি দেখা করেছিলাম ১৯৭০-এর মাঝামাঝি সময়ে, লণ্ডনে। সে সময়ে আমি জেনেছিলাম যে, তিনি একজন অত্যন্ত বিনয়ী

ব্যক্তি যিনি সব সময় কাজকে স্থান দিতেন প্রথমে এবং নিজেকে রাখতেন শেষে। তবে সেটা ছিল কেবল যখন আমি ম্যানচেস্টারে ছিলাম এবং তখনই তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত চুপচাপ এবং তিনি যেখানে বসবাস করতেন সেখানে তিনি কীভাবে বসবাস করতেন, তাঁর অবস্থা সম্পর্কে তিনি কখনো বলতেন না। টাকা বাঁচানোর জন্যে তিনি কাউন্সিল স্টেটে দুই-ঘর বিশিষ্ট ফ্ল্যাটে থাকতেন। তিনি গরম পানি ও তাপ ব্যবস্থা ছাড়াই থাকতেন, এমনকি শীত মৌসুমেও। আমি সেখানে থাকার সময় সেখানকার আবহাওয়া খুবই ঠাণ্ডা ছিল। তিনি একটা ধীর গতিসম্পন্ন কুকারে তাঁর ভিন্নধর্মী খাদ্য প্রস্তুত করেন। সেটা ছিল ৩৫ ওয়াটের বাল্ব লাগানো একটা বিরাট বাক্স বিশেষ। তাতে তিনি চাল চড়িয়ে দিতেন যা প্রায় ১২ ঘন্টার পর সবকিছু তৈরি হতো।

আমার মনে পড়ে, একসময় তাঁর ওয়েলফেয়ার ভাতা বন্ধ হয়ে যায়। কারণ তাঁকে বাজারে লেবার দিতে বলা হয়েছিল, যা প্রতিপালনে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। আর তারপর তাঁকে ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়েছিল বলে বলেছিলেন এবং বিশাল হা্উজিং ব্লকের খোলা প্রাঙ্গন থেকে তিনি মাটি খুঁড়ে শিকড় তুলে সবজী হিসেবে ব্যবহার করতেন। বেশ কয়েকটা জাম্পার, তার উপর কম্বল ভালোরকম জড়িয়ে এবং মাঝে মাঝে মোটা শীতের কোট গায়ে তিনি তাঁর ফ্ল্যাটে ঘুরে ঘুরে হাঁটতেন। আমি যেমনটা অনুভব করলাম, সেটা ছিল সরবরাহের প্রান্ত সীমায় থাকা এক জীবন। আর আক্ষরিক অর্থে, তিনি ১৯৭০-এর পূর্বকালের এক টাইপরাইটারে লিখে প্রচারকার্য পরিচালনার কাজে তাঁর প্রতিটি সেন্ট ব্যয় করতেন। সাম্প্রতিককালে ভেঙে পড়া পর্যন্ত তিনি সেটা ব্যবহার করেছিলেন এবং অতপর হাতের ব্লক লেটারে তিনি রিপোর্ট লিখতেন।

জনগোষ্ঠী, এনজিও, সরকার ও পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর বিশাল জ্ঞান ছিল এবং সারা বিশ্বে তাঁর সকল মন্ত্রণালয় ও সরকারের সাথে যোগাযোগ ছিল। আর তিনি সর্বদা জানতেন কার সাথে, কি ও কোন বিষয়ে যোগাযোগ করতে হবে। তিনি পাহাড়ী জনগণের ভবিষ্যতকে সর্বদা সম্মুখবর্তী রাখতেন, তবে পূর্বপাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশের মাইক্রো লেভেল ও ম্যাক্রো লেভেল- এই উভয় পর্যায়ের রাজনীতি নির্ভুলভাবে বুঝতেন। এর ফলে তিনি আন্ত:আঞ্চলিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পোষণ করতেন।

তাঁর লক্ষ্য ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার প্রতিষ্ঠা করা। পার্বত্যাঞ্চল এবং চতুর্পাশ্বস্থ প্রতিবেশী দেশগুলোর ভূ-রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে, সেটা ছিল বাস্তব সম্ভাবনা অপেক্ষা অধিক রূপকল্প। তাঁর পারিপার্শ্বিক পদচারণা ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে, তবে একজন অধিকারকর্মী (এ্যাক্টিভিস্ট) হিসেবে এবং একজন মানুষ হিসেবে তাঁর পদচারণা ছিল বস্তুত অত্যন্ত বিশাল পরিসরে। এই বাস্তব সত্য দ্বারা আমি গভীরভাবে অভিভূত হয়েছি যে, তাঁর সেই দুই-ঘরবিশিষ্ট ছোট্ট ঘরটি ছিল পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে প্রায় বিশ্বব্যাপী পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের মানবাধিকারের পক্ষে একটি প্রচার কেন্দ্র। আর সেক্ষেত্রে ন্যূনতম বাজেটের অর্থ তিনি সত্যিকার অর্থে কার্যকরভাবেই ব্যবহার করতেন।

রামেন্দু বাবু, আপনার প্রতি আমার পূর্ণ প্রশংসা/শ্রদ্ধা ছিল এবং আছে। সত্যিকারের শাব্দিক অর্থে সার সংক্ষেপ করে বললে বলতে হয়, তিনি ছিলেন একজন উপাসক, একজন পূজারী; এবং ফলে তাঁর জীবনের অন্য একটা দিকে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁর বৌদ্ধ মতবাদে বিশ্বাসই তাঁকে তাঁর জীবনের চড়াই-উৎরাই এবং পার্বত্যঞ্চলের মানুষের ভবিষ্যত ভাগ্যের সাথে মেত্তা বা মৈত্রী ভাবনায় থাকতে বা চলতে সক্ষম করেছিল। তবে তাঁর এই অঙ্গণ প্রেমময়-দয়াদরদী হলেও তাঁর সেই অবস্থান তাঁকে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কারা মানবাধিকার লংঘনকারী অপরাধী এবং কারা মুনাফাধারী তা পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বিরত রাখতে পারেনি। তাঁর সেই নিয়মিত ধ্যান-ভাবনা ছিল তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের দিকনির্দেশনা এবং তাঁকে একাধারে অধিকার কর্মী হিসেবে এবং সর্বত্যাগী সন্যাসীর মতো জীবন যাপনে সাহায্য করেছিল। আমি তাঁকে একজন অধিকার কর্মী এবং একজন বন্ধু হিসেবে জানি। তাঁর স্থান পূরণ করা সম্ভব নয়। কেবল সম্ভব একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে তাঁর নীতি-আদর্শ সংরক্ষণ করা এবং জীবিত রাখা। সেটা করতে পারলেই তাঁর প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞতা জানানো বলে মনে করি। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

সঞ্চালক: প্রফেসর উল্ফগ্যাং মে'কে ধন্যবাদ। উল্ফগ্যাং-কে আমার মনে পড়ে, যখন তিনি প্রথমবার পার্বত্যঞ্চলে এসেছিলেন, মনে হয় সেসময় তিনি একটা বাড়িতে আমাদের সাথে ছিলেন। আমরা তখন খুবই ছোট ছিলাম। আর এখন আপনাকে দেখতে পাওয়াটা এক অপূর্ব সুযোগ বলা যায়। আর পার্বত্যবাসীদের প্রতি আপনার সমর্থনের প্রতিশ্রুতি, যা এখনো চলমান এবং চির বলিষ্ঠ, সত্যিই অতুলনীয়। ড. আর এস দেওয়ানের প্রতি আপনার হৃদয়স্পর্শী ট্রিবিউট-এর জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। যেমনটা বলছিলেন, তিনি একজন বিস্ময়কর, বিনয়ী, অত্যন্ত উষ্ণ হৃদয় সম্পন্ন, দয়ালু এবং মহৎ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আমি ঠিক অন্য একটা দিনের কথা বলছিলাম, কিভাবে জাতিসংঘে উনার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তিনি প্রথমে আমাকে একটি স্যান্ডউইচ দিয়ে বললেন, 'প্রথমে খাও এবং কোমর শক্ত করে নাও, যাতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যেতে পারো।' সেটাই ছিল তাঁর

মন্ত্র, কিভাবে আমাদেরকে কাজে লেগে থাকতে হবে। ড. মে ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের অন্যতম একজন সহ-প্রতিষ্ঠাতা।

আর আমরা এখন বক্তব্য শুনবো পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের অন্য আরেকজন সহ-প্রতিষ্ঠাতার কাছে। আমি এখন আমন্ত্রণ জানাই জেনেকে-কে। জেনেকে এরেন্স যিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের পক্ষে আজীবন প্রচারক। আমি অবশ্যই উল্লেখ করবো, তিনি অত্যন্ত সাদা-সিদে জীবন-যাপন করেন, যাতে তিনি অন্যদের জন্য যে সমর্থন করছেন সেটা তিনি করতে পারেন। জেনেকে, এখন মাইকটা আপনার কাছে।

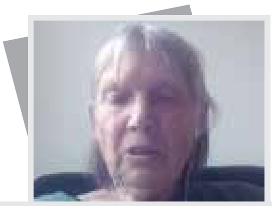

জেনেকে এরেন্স:

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, চন্দ্রা। আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি একথা ভেবে যে, রামেন্দু দেওয়ানকে সম্মান জ্ঞাপন করতে আমি এখানে উপস্থিত থাকতে পেরে। রামেন্দু শেখর আমাদের সবাইয়ের কাছে অত্যন্ত কাছের মানুষ ছিলেন, সে বিষয়ে আপনারা আগেই উল্লেখ করেছেন। সত্যিই তিনি একজন অত্যন্ত বিনয়ী এবং সুন্দর ব্যক্তিত্বের অধিকারী লোক ছিলেন। সেই সাথে আমি এটাও একটু উল্লেখ করতে চাই যে, দুর্ভাগ্যবশত উইলিয়াম ভ্যান এই আলোচনা সভায় উপস্থিত হতে পারেননি। তাই ইয়ান আর আমি, আমরা দু'জনে 'অর্গ্যানাইজিং কমিটি সিএইচটি ক্যাম্পেইন'-এর পক্ষে এখানে প্রতিনিধিত্ব করছি। আমাদেরকে এই সভায় সম্পৃক্ত করার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর আমি খুবই খুশী যে, আপনাদের মধ্যে কাউকে কাউকে এখানে দেখতে পাচ্ছি, যাঁদের সাথে অনেক অনেক দিন ধরে দেখা হয়ে ওঠেনি।

রামেন্দু দেওয়ানের সাথে আমাদের প্রথম দেখা হয় ১৯৮৬ সালে যখন আমরা আর্মস্টারড্যাম-এ প্রথমবার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেছিলাম। উক্ত সম্মেলন আয়োজক ছিল 'অর্গ্যানাইজিং কমিটি সিএইচটি ক্যাম্পেইন', যেটা আমরা গঠন করেছিলাম মূলত সেই সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার জন্য। আর আমি অবশ্যই বলবো যে, রামেন্দু এবং ইবগিয়া, উভয় পক্ষই সম্মেলন চলাকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম তদন্ত কমিশন গঠনকল্পে উদ্যোগ গ্রহণে সর্বাত্মক ভূমিকা পালন করেছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন গঠনে এবং কমিশন কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে সরেজমিন তদন্তের কাজে সহযোগিতা প্রদানে রামেন্দুও সাংঘাতিকভাবে সক্রিয় ছিলেন। আমরা যখন লণ্ডন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের তদন্তের জন্য যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, সেসময় আশ্চর্যজনকভাবে রামেন্দু আমাদের সামনে পার্বত্য চট্টগ্রামের অত্যন্ত সুবিস্তৃত একটা ম্যাপ নিয়ে উপস্থিত হন, যেটা আমরা আমাদের যাত্রা-প্রস্তুতি এবং প্রকৃত পরিস্থিতি নিরূপনের কাজে সফলভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিলাম। আর সেটা ছিল একেবারেই চমকপ্রদ। অবশ্য তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে সমস্ত মিটিং-এর প্রস্তুতির জন্য জেএসএসের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন। বস্তুত রামেন্দুকে ছাড়া আমরা ঐ যাত্রাটা এতটা ভালোভাবে গোছাতে পারতাম না, যা আমরা তাঁর পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতায় সন্দুরভাবে করতে পেরেছিলাম।

আর সেটা ছিল সত্যিই চমৎকার যখন আমরা নিজেদের জন্য এত বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। কেননা জেএসএস-এর অন্য কোন লোকের সাথে আমাদের কারোর কখনো সরাসরি যোগাযোগ ছিল না। তাই রামেন্দু'র সহায়তা ছিল খুব খুবই জরুরী এবং কার্যকরী। আর তিনি যে শুধু ম্যাপ তৈরি করে দেননি, বাস্তব ক্ষেত্রেও পার্বত্যঞ্চলে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক লোক সংগঠিত করে রেখেছিলেন। ফলে আমরা যেখানে যাচ্ছিলাম, সেখানে আমাদের সাথে দেখা করার জন্য জেএসএস আগেভাগে প্রচুর লোক সংগঠিত করে রেখেছিলেন। আমার মনে পড়ে, আমাদের সফরের জন্যে প্রধীর অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রধীরের কাজে আমি সত্যিই অত্যন্ত অভিভূত হয়েছিলাম। আমাদের সাথে দেখা করা এবং অনেক কিছু বিষয়ে অবগত করিয়ে দেয়ার মতো সেরকম একজন সাহসী ব্যক্তি ছিলেন প্রধীর। পার্বত্য চট্টগ্রামে সরেজমিন তদন্তকালে প্রচুর সাহসী জুম্ম দেখেছিলাম এবং সেটা ছিল সত্যিই চমৎকার।

আর আমি রামেন্দুর প্রতি কৃতজ্ঞ, আমাদের সফর এবং সরেজমিন তদন্তের জন্য জেএসএস সেরকম তথ্যাবলী ব্যবস্থা করে রেখে দিতে পেরেছিল। বস্তুত তিনি ছিলেন অত্যন্ত চমৎকার ব্যক্তি। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি চলে গেছেন শুনে আমি সত্যিই কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে পড়েছিলাম। সম্পূর্ণ একা অবস্থায় তিনি পরপারে চলে গেলেন। আর সেটাই ছিল সত্যিকারভাবে সবচেয়ে বড় শোক। আমি সত্যিই আপ্লুত হয়েছিলাম, আমি জানি না তার মতো এমন কেউ আছেন কিনা যিনি নিজের মানুষের জন্য এভাবে এত নিঃস্বার্থভাবে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাই আমি তাঁর জীবন এবং কর্মের প্রতি অতীব শ্রদ্ধাশীল। এটুকুই বলে আমি শেষ করছি।

সঞ্চালক: ধন্যবাদ জেনেকে'কে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের প্রতি আপনার সদাসর্বদা সহায়তার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। একটা ব্যক্তিগত বিষয়ে আপনাকে জানাই যে, আমি

প্রকৃত অর্থে হল্যাণ্ডে থাকার সময়ে আপনার কাছ থেকে যে সমর্থন পেয়েছিলাম সেজন্য অকৃত্রিম ধন্যবাদ। আর অবশ্যই ইয়ান, উইলেম এবং অর্গানাইজিং কমিটির প্রতিও অশেষ ধন্যবাদ। আর অবশ্যই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের আত্মিয়িন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে আমরা যতই এগোই, তাতে আপনাদের নিরবিচ্ছিন্ন সাহায্য-সমর্থনের উপর আমরা খুবই ভরসা করে থাকি।

এখন আমরা যাবো প্রফেসর ড. এলসা স্ট্যামেটোপৌলৌ-এর কাছে। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের কো-চেয়ার। আর যেমনটা ড. আদিত্য দেওয়ান বলেছেন, তিনি একজন খুবই সক্রিয়, খুবই সজ্জন ব্যক্তি। তিনি এখন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দফতরে জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের সাবেক চীফ, তিনি আমার পূর্বসূরী। আমি তাঁর বিশাল পদচারণা অনুসরণ করি। এলসা, ফ্লোর এখন আপনার, অনুগ্রহপূর্বক আপনার বক্তব্য শুরু করুন।

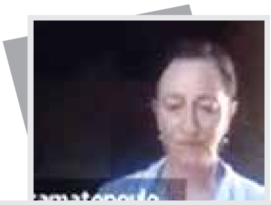

ড. এলসা স্ট্যামেটোপৌলৌ:

চন্দ্রা, আপনাকে এবং প্রত্যেককে অনেক ধন্যবাদ, আমাকে এখানে আমন্ত্রণ করার জন্য। এটা সত্যিই আমি খুবই সম্মানিত বোধ করছি। এখানে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি খুবই অভিভূত। আর আমি উপলব্ধি করছি যে, যদিও তার সাথে আমার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ হয়নি, ড. আর এস দেওয়ান তাঁর ব্যক্তিগত কাজের মধ্য দিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তিনি যে ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন, তার ধারাবাহিতাকয় আমরা সেই কাজ করে যাচ্ছি।

সম্মানিত জ্যেষ্ঠ, প্রিয় বোনেরা ও ভায়েরা, প্রিয় বন্ধুরা, আজ আমরা ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তিনি ছিলেন একজন নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত মানবাধিকার প্রবক্তা, যিনি বাংলাদেশের আদিবাসী জুম্ম জনগণের সম্মান ও আত্মনিয়ন্ত্রণাকিার প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁর জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। অভিবাসন (প্রবাস) এবং স্বেচ্ছা নির্বাসন হলো যে কোন জাতিগোষ্ঠীর সংগ্রামে প্রায় সময় একটা বড় চ্যালেঞ্জ, বিশেষত দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক সংগ্রামে, বিশেষ করে কঠিন পরিস্থিতিতে, ঠিক যেমনটা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সংগ্রামে।

ড. আর এস দেওয়ান ছিলেন তাঁর জনগণের কাছে নিবেদিত প্রাণ, সাহস এবং রূপকল্পের অনুপ্রেরণামূলক উদাহরণ। তাঁর জনগণকে সুরক্ষার জন্যে এবং শান্তি, মানবাধিকার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সমর্থনে তাঁর আন্তর্জাতিক প্রচারকার্যে তিনি যে একাত্মতা এবং মতাদর্শ প্রদর্শন করেছেন তা বিশ্বব্যাপী বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে। আর যে মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করে গেছেন, ড. দেওয়ান চিরকাল স্মরণীয় এবং বরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি শান্তিতে বিশ্রাম করুন, আর বিশ্বের যে প্রান্তে থাকি না কেন, আমাদের চেষ্টা থাকবে আমরা সবাই যেন তাঁর প্রয়াসকে চলমান রাখতে পারি।

প্রিয় বন্ধুরা, আজ জুম্ম জনগণের পক্ষে দাঁড়ানো হচ্ছে উচ্চমানের কাজ, কারণ আপনারা যারা প্রতিরোধ করেছেন, লেগে আছেন এবং সেরকম অনুপ্রেরণা ও সাহস নিয়ে শান্তি এবং আলোর স্বপ্নকে চালিত করেছেন। আপনারা আপনাদের জীবনের রূপকার হতে চেয়েছেন, আর আমরা আপনাদের দুর্দশা, আপনাদের সম্প্রদায়ের, ছেলেমেয়েদের এবং নাতি-নাতনীদের দুঃখ-দশাকে স্বীকৃতি প্রদান করেছি। আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে চাই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগণকে, ক্ষতিগ্রস্ত লোকদেরকে এবং হামলার থেকে বেঁচে থাকা লোকদের, যারা আপনারা অশান্তি ও মানবাধিকারহীনতার কারণে দুঃখ-দুর্দশার মুখোমুখী হয়ে আসছেন। তাই আমি আদিবাসী মানবাধিকার সুরক্ষাকারী কর্মীদের সাথে, যারা তাদের জনগণের রক্ষার জন্যে অত্যাচারিত হয়েছেন এবং এমনকি হত্যার শিকার হয়েছেন, তাঁদের সাথে আমি একাত্মতা প্রকাশ করছি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা দীর্ঘকাল ধরে টিকে আছে। জনগণ শান্তি এবং মানবাধিকারের জন্যে, সমতার জন্যে, বৈচিত্র্যতার জন্যে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্মব্যাপী ন্যায্যতার জন্যে মুখিয়ে আছে। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে একটা প্রকৃত প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন, যা সরকার এখনো প্রদর্শন করতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘন অব্যাহতভাবে চলছে। আদিবাসী নারীর উপর সহিংসতাও কোন অংশে কম ঘটছে না। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক কমিশন যার কো-চেয়ার হিসেবে আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের ইস্যুকে ছেড়ে দিতে পারি না। তবে এটা উদ্বেগের বিষয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয়টা সমাধান না হওয়ায় এখনো মানবতার বিবেকের উপর ভারী বোঝার মত ভর করে আছে।

আপনাদের সংগ্রাম আন্তর্জাতিক আইনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র হল সংঘাত প্রতিরোধ ও সমাধানের জন্য একটা প্রধান নৈতিক কাঠামো। এতে এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা রয়েছে, এবং এতে বলা হয়েছে যে,

আদিবাসীদের ভূখণ্ডে তাদের স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতি ছাড়া সামরিক কার্যকলাপ চালানো যাবে না।

প্রিয় বন্ধুরা, আমরা জানি যে, আদিবাসীদেরকে প্রভাবিত করে এমন সংঘাত প্রায়শই অপ্রকাশিত থেকে থাকে। সৌভাগ্যবশত এটা আদিবাসী জনগণের এ্যাডভোকেসির জন্য উৎসাহব্যঞ্জক যে, আমরা জাতিসংঘে আদিবাসী-বিষয়ক তিনটি সংস্থা পেয়েছি, যেগুলো অবশ্যই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীসহ বিশ্বের সকল আদিবাসী জনগণের অধিকার ত্বরান্বিত ও সুরক্ষা করছে এবং যে কোন অপ্রকাশিত সংগ্রামের উপর আলোকপাত করছে। আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরাম ২০১৬ সালে এবং এবছর শান্তি ও সংঘাত এবং আদিবাসীদের উপর আলোকপাত করেছে। আর উভয় ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, শান্তি ও ন্যায্যতাকে অবশ্যই একসাথে মিলাতে হবে এবং এবছর সুনির্দিষ্টভাবে শান্তি স্থাপনে আদিবাসী জনগণের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্বের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

আরো বলা হয়েছে, শান্তি প্রতিষ্ঠার সাথে আন্ত:প্রজন্মগত সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এবং তরুণদের মধ্যে মৌলবাদ ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা এই শিক্ষার প্রতি লক্ষ রেখেছি। আর প্রকৃত পক্ষে, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সংগ্রাম থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আমরা শিখেছি যে, যখন দেশে কাজ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, তখন আমরা সেখানে গিয়ে থাকি যেখানে আন্তর্জাতিক সংহতি রয়েছে। এটা হচ্ছে অন্যান্য আদিবাসী জনগণ, অআদিবাসী জনগণ, সবাইয়ের সমন্বয়ে এটা এমন একটা আন্তর্জাতিক সংহতি, যেখানে নানা সম্ভাবনা ও নেটওয়ার্কের সুযোগ থাকে এবং সমাধানের পথ দেখায়, সমাধানের পথ পেতে সাহায্য করে এবং সম্ভাবনাময় সৃজনশীল উপায় বাৎলে দিয়ে থাকে।

ড. দেওয়ানের কর্ম থেকে আমরা জানি যে, প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রচারনার অর্থ হল জাতীয় স্তর থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে আমাদের নাগরিকত্বের সম্প্রসারণ। জনগণের অধিকারের জন্য আন্তর্জাতিক প্রচারনার ফলে ঐক্য-সংহতি ও নেটওয়ার্ক সক্রিয় হয়ে উঠে, সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়, যেটা জাতীয় স্তরে অসম্ভব বলে মনে হতে পারে। এটি আমাদের সবাইকে সাধারণ মানবতার সাথে সংযুক্ত করে থাকে। সেজন্যে আমরা সবাই আজ এখানে একত্রিত হয়েছি। আমরাজানি যে, আপনারা প্রচারাভিযানে জড়িত থাকবেন, অংশগ্রহণ করবেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের নেতা হিসেবে আপনারা আপনাদের ক্ষমতা অনুশীলন করবেন এবং সমস্যা সমাধানকল্পে আপনারা ঐক্য-সংহতি, আশাবাদ এবং সৃজনশীলতা গড়ে তুলবেন।

ড. দেওয়ানের জীবন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে উপসংহারে একথা বলতে চাই যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার চলমান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা তাদের নিজেদের ইতিহাস লিখছে, এবং তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা ব্যক্ত করছে। যে চারটি শব্দ যা আমার মনে উদয় হয়েছে তা হল- প্রতিরোধ, লেগেথাকা, স্থায়িত্ব এবং রূপকল্প। এগুলো হল জুম্ম জাতির শব্দসমষ্টি। আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাকে এসব কথা শেয়ার করতে সুযোগ দেয়ার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আর আজকে আপনাদের সাথে থাকতে পেরে আমি সত্যিই আভিভূত। চন্দ্রা, আপনাকেও ধন্যবাদ।

সঞ্চালক: আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, এলসা। বরাবরের মতো, একটা অত্যন্ত পরামর্শমুলক এবং অনুপ্রেরণাদায়ক বক্তব্য যা সবাইকে খুব ভালোভাবে এক সাথে গ্রোথিত করেছে, আর পরিশেষে এই প্রজ্ঞাময় শব্দমালা আমাদেরকে রেখে দিয়ে গেলেন তা সত্যিই উদ্দীপনামূলক। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। এখন আমরা সফি'র কাছে যাবো, সফি গ্রিগ। সফি, আমাদের মাঝে থাকার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি জানি, আপনি এখন অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে আছেন, তা সত্ত্বেও অনলাইনে থাকার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। সফি, আপনার বক্তব্য শুরু করুন।

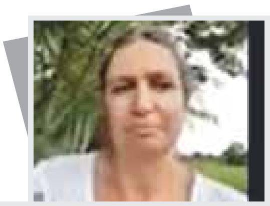

সফি গ্রিগঃ

আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, আর একই সাথে আমি ক্ষমাপ্রার্থী, কেননা আমি এখন বাইরে এক পার্কের মধ্যে আছি আমার মেয়েকে নিয়ে। আর আশা করছি বিঘ্ন ঘটার মতো এখানে খুব একটা লোকসমাগম হবে না।

এই স্মরণসভা আয়োজন করার জন্য আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আর প্রত্যেকের মতো ড. আর এস দেওয়ানের মৃত্যু সংবাদ শুনে এবং যেভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে তা জেনে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলাম। আর অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, তিনি যুক্তরাজ্যে এসেছিলেন আর শেষ পরিণতিতে আমরা তাঁর সাথে সেখানে থাকতে সক্ষম ছিলাম না। প্রত্যেকের মতো, আমিও মনে করি, তাঁর সেরকম একটা দীর্ঘ কর্মময় এবং ব্যতিক্রমধর্মী জীবনের অধিকারী ব্যক্তিকে হারানো আমাদের সবাইয়ের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি এবং শোকবহ।

আমার অন্যতম প্রথম স্মৃতি হলো, আজ থেকে ২৬ বছর আগে, যখন সার্ভাইভাল ইন্টারন্যাশনালে আমি কাজ শুরু করি,

আপনারা অনেকে যতদিন ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের পক্ষে প্রচারাভিযানে সম্পৃক্ত আছেন, তার তুলনায় তা অতটা দীর্ঘ নয় হয়তো। তবে রামেন্দু-এর সাথে আমার প্রথম স্মৃতি হল, যেমন আমরা তাঁকে 'রিপোর্ট' বলে ডাকতাম। এমনকি তখনো সেই রিপোর্টগুলো ছিল টাইপ-রাইটারে হাতে টাইপ করা, সেভাবে রিপোর্ট লিখে তিনি বেশ দীর্ঘকাল ধরে চালিয়ে গিয়েছিলেন। আর ততক্ষণে তিনি সার্ভাইভালে একজন ভীষণ পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছিলেন। লোকেরা তাঁর সম্পর্কে আমাকে বলতো এবং কিভাবে সেসব রিপোর্টগুলো এক দশক ধরে চলে আসছিল এবং রিপোর্টগুলোর মাধ্যমে সার্ভাইভাল ও অনেক সংস্থা প্রচার কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম করেছিল। যেমনটা আমি নিশ্চিত, আপনারা সবাই তাঁর রিপোর্টগুলো স্মরণ করতে পারেন, রিপোর্টগুলো এতই অবিশ্বাস্যরকম বিস্তারিত ও সযত্নে সবিন্যস্ত তথ্য দিয়ে সাজানো হতো যা প্রকৃতভাবে আমাদেরকে এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য ৩০০ জন ব্যক্তি ও সংস্থাকে যারা সেগুলো পেতেন, তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঠিক কি কি ঘটছিল তা উম্মোচন করার জন্য এবং নিশ্চিতরূপে সারা বিশ্বকে অবহিতকরণে সক্ষম করেছিল। রামেন্দু ছাড়া সেরকম কাজ করা একেবোরেই অসম্ভব ছিল। আমার মনে হয়, তাঁকে ছাড়া এবং তিনি যে তথ্যাবলী তৈরি করে অনেকের সাথে রিপোর্ট শেয়ার করতেন, সেগুলো ছাড়া সার্ভাইভাল অত সময় ধরে কখনো প্রচার কাজ করে যেতে পারতো না। আর আমার বিশ্বাস, তিনি যা করেছিলেন, সেই কাজ না হলে এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রামে অত্যাচারের মাত্রা তুলনামুলকভাবে আরো ঢের বেশি হতো।

আমি সত্যিই দুঃখিত যে, তাঁর সাথে আমার ব্যক্তিগতভাবে কখনো দেখা হয়নি। তবে আমি অনুভব করি তাঁর সাথে আমার আসলে দেখা হয়ে গেছে। কারণ যখন তাঁর ল্যাণ্ড-লাইন ফোন ছিল, আমরা ফোনে তাঁর সাথে কথা বলতাম, বিশেষ দিনে শুভেচ্ছা কার্ড ও চিঠি বিনিময় করতাম এবং তা আমরা অনেক বছর ধরে করেছি। আর আমি সবসময় পরিকল্পনা করতাম, কখনো ম্যানচেস্টারে গেলে তাঁর সাথে দেখা করবো। কিন্তু আমি কখনো সেখানে যাওয়ার কাজটা করতে পারিনি। যেজন্য অবশ্যই আমি এখন বিষাদময় দুঃখবোধ করছি।

কম লোকই আছেন যারা তাঁর মতো করে মূল কাজের প্রতি নিবেদিত প্রাণ, নিজের জন্য না করে তাঁর অর্থসম্বল ও শক্তিসামর্থ সবকিছু নিজের জনগোষ্ঠীর অধিকারের পক্ষে প্রচারনার কাজে ব্যয় করতেন। আর যারা লণ্ডনে যেতো বা লণ্ডন থেকে আসতো সেসব বন্ধুদের কাছ থেকে আমি গল্প শুনতাম আর জানতাম যে, নিজের জন্য এমনকি বিদ্যুৎ বা উষ্ণতার জন্য অর্থব্যয় করতে তিনি কীভাবে অরাজি হতেন, ঠাণ্ডা খাবার খেতেন এবং এমনকি ইংল্যাণ্ডের শীততম মৌসুমেও তাঁর ফ্ল্যাটে উষ্ণ-তাপ ব্যবস্থা করতে নিমরাজী ছিলেন।

নিজেকে যে কোন আরাম উপভোগ করতে বা উষ্ণ রাখতে রাজি না হলেও তিনি নিজে আবিশ্বাস্য রকমের দয়ালু এবং উষ্ণ ছিলেন। আর তিনি সবসময় স্মরণ করতেন আমার পরিবার, আমার ছেলে-মেয়ে, তাদের নাম, বয়স ইত্যাদি। সবসময় তাদের বিষয় নিয়ে জানতে চাইতেন, স্মরণ করতেন, 'ও, ডিলান এখন নিশ্চয়ই ১৮ বছর হবে, অভিনন্দন! তিনি সেরকম এতটাই চিন্তাশীল, দয়ালু এবং উষ্ণ ছিলেন। এটা সেরকমই এক ধরনের অনুভূতি, যা তাঁর মতো লোক থেকেই উৎসারিত হতো। আমার পার্বত্য চট্টগ্রামে সফরে কথা, তাঁর পরিবারের কারো কারোর সাথে দেখা করার কথা মনে পড়ে। তাঁর ব্যাপারে তারা বেশ গর্ববোধ করে থাকেন। আর সেখানে যাওয়া এবং তাদের সাথে সময় কাটানোর মুহূর্ত ছিল সত্যিই চমৎকার। আর আমরা যা যা করতে পেরেছিলাম সবই তাঁর কাজের বদৌলতে হয়েছিল। তাঁর কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে আমার মুখ থেকে শুনতে পাওয়া পরিবার-পরিজনদের পক্ষে ছিল সত্যিই গর্বের বিষয়। আর তারা রামেন্দুর পার্বত্য চট্টগ্রামে ফিরে আসার ব্যাপারে এতটাই মনপ্রাণে চেয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্গত কারণে তিনি তা কখনো করেননি। তবে তাঁর পরিবারের সাথে দেখা করাটা এবং তাদের গর্ববোধের অনুভূতি আমার জন্য সত্যিই একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা ছিল।

তিনি অবিশ্বাস্য রকম উদারও ছিলেন। মনে পড়ে, আমার সহকর্মী ফিওনার কথা, যাকে বলতে শুনেছি যখন তিনি জাতিসংঘে গিয়েছিলেন এবং একটা বড়সর আদিবাসী দলকে নিয়ে শিক্ষাসফরে বের হয়ে শেষে একটা ক্যাফেতে গিয়ে বসলেন, তখন রামেন্দু জিদ করে বসলেন যে, তিনি পুরো দলের জন্য কফি কিনবেন। আর সেদিন তিনি এক বৈঠকে পানীয়ের জন্য যা ব্যয় করেছিলেন তা নিশ্চয়ই তাঁর পুরো এক বছরের ব্যয় হবে, সম্ভবত একটা যুগের ব্যয়কেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তবুও তাবৎ পর্যন্ত তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা, উদার এবং উষ্ণ। আর সার্ভাইভালে প্রত্যেকে তাঁর নাম জানেন আর তিনি সেটার যোগ্যও ছিলেন বটে। তিনি সত্যিই তাঁর উষ্ণতা, উদারতা এবং উৎসর্গীকৃত হৃদয়ের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। আর আমি মনে করি, আমাদের কাছে এবং দূর-দূরান্তের অনেক লোকের কাছে তিনি ছিলেন অনুপ্রেরণার একটা উৎস। তাঁর সব ত্যাগ-তিতীক্ষা, হৃদয়ের উষ্ণতা এবং দয়ালুতার কারণে আমরা সবাই তাঁর অনুপস্থিতি নিদারুণভাবে অনুভব করবো। আমরা খুবই শোকাহত যে, তিনি চলে গেছেন।

সঞ্চালক: আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সফি। সার্ভাইভাল ইন্টারন্যাশনাল থেকে আমরা যা পেয়েছি সেজন্যে আমাদের সবাইয়ের তরফ থেকেও ধন্যবাদ জানাই। আর আমাদের

সামনে এগিয়ে চলার সাথে আমরা অবশ্যই আপনার চলমান সহায়তার জন্য আপনার উপর ভরসা রেখে চলছি। ড. রামেন্দু সম্পর্কে বলি, আমার মনে পড়ে, আমার বাবা নিয়মিত তাঁকে সাহায্য করতেন আর তিনি তা নিতে অস্বীকার করতেন। একমাত্র উপায় ছিল যা দিয়ে আমরা তাঁকে গ্রহণ করতে রাজি করাতে পেরেছিলাম, আর এটা হল পোস্টাল ব্যয়ের জন্য, যা তাঁকে নির্বাহ করতে হতো, তাঁর সেসব দলিলপত্র বাইরে পাঠানো ও কাগজ কেনার জন্য এই অর্থ দেয়া হয়েছে। আর আপনি যদি সেভাবে তুলে ধরতে পারেন, তবে তিনি একটা সামান্য কিছু অর্থ রাখতেন।

আমরা এখন যাবো ইয়ান-এর কাছে। ইয়ান রিগুার্স, অত্যন্ত উত্তম ও চমৎকার যে, অনেক বছর পর আপনাকে দেখতে পেলাম। আর তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রচারাভিযানের একজন খুব শক্তিধর, ভরসাযোগ্য সমর্থক। ইয়ান, মাইক্রোফোনটা এখন আপনার, প্লীজ এগিয়ে যান।

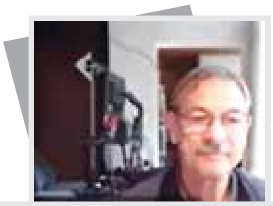

ইয়ান রিডার্স:

অনেক ধন্যবাদ। প্রত্যেককে শুভদিন জানাই। আমি সংক্ষিপ্ত করবো। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ইত্যবসরে আলোচনা হয়ে গেছে। ড. আর এস দেওয়ান, আমাদের কাছে রামেন্দু, সদা সর্বদা রামেন্দু। তিনি ড. দেওয়ান, তিনি সবসময় বলতেন, 'আপনাদের সাথে সাক্ষাতে খুশী হলাম।' বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন উপলক্ষে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বহুবার তাঁর সাথে দেখা হয়েছে। আসলে সফি যা বলছিলেন, নিজের খরচের ব্যাপারে তিনি কঠোর মিতব্যয়ী ছিলেন, কিন্তু যখন আমরা সদলবলে তাঁর সাথে দেখা করতাম, তিনি আমাদের বেলায় ঠিকই ব্যয় করতেন। তিনি সবসময় আমাদেরকে খাওয়াতে চাইতেন। আর আমরা জানতাম সেটা তাঁর জন্য কঠিন হবে, কিন্তু তিনি জেদ করতেন। সেই অর্থে তিনি ছিলেন পুরোদস্তুর একজন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ লোক। তিনি দৃঢ় থাকতেন যে, 'আমি এই কাজ করছি, তবে আমি চাই অপনারা সেই কাজে যোগ দিন, তাই আমাকে আপনাদেরকে খুশী রাখতে দিন।'

আমি যদি সেসব বছরগুলোর দিকে ফিরে তাকাই, যে সময়ে তাঁর কাছ থেকে আমরা নিয়মিত তথ্য পেয়ে আসছিলাম, আমার মনে পড়ে, তাঁর জোরালো ভূমিকার ফলে অত্যাচার-উৎপীড়নের ঘটনাগুলোর তালিকা যথাযথভাবে দালিলীকরণ করার কাজ চলমান রাখা সম্ভব হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে রিপোর্টে ঘটনার প্রমাণ তুলে ধরা হতো, প্রামাণ্য তালিকা লিপিবদ্ধ করা হতো। কেউ কেউ বলতেন, 'এটা বড্ড বেশি বিস্তারিত, এটা অতি-আবেদন করা হয়েছে।' পরিশেষে যদি ঘটনার কোন পরিসংখ্যান না থাকে; ঘটনার যদি বিস্তারিত বর্ণনা না থাকে; নতুন পরিস্থিতিতে কি ঘটনা ঘটছে তার বর্ণনা যদি না থাকে, যদি আপনি একটা মামলা করতে চান, যদি আপনি ঘটনার বিস্তারিত জনসমক্ষে তুলে ধরতে চান, তাহলে সেই রিপোর্ট আর কাজ করে না। যথাযথ দালিলীকরণের সেই কাজটি তিনি সেসময় ক্রমাগত যথার্থভাবে করে আসছিলেন। তিনি পোস্টেজ, পেপার, প্রিন্টিং এবং ফটোকপি করার কাজে অর্থ ব্যয় করে আসছিলেন। তবে লণ্ডনে আমরা যে বিক্ষোভের আয়োজন করেছিলাম তাতে তিনিও এসেছিলেন। লন্ডনে আমরা পিকেটিংও করেছিলাম। সেখানেও তিনি এসেছিলেন। তিনি একটু সতর্ক ছিলেন, তারপরেও তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

আমি তাঁকে স্মরণ করছি, একজন ব্যক্তি হিসেবে যিনি ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অধিকার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই লক্ষ্যে তিনি তাঁর সমস্ত জীবন ব্যয় করেছিলেন। আমি তাঁকে স্মরণ করছি একজন মহান বন্ধু হিসেবে। তাঁর সাথে কাজ করার মতো তিনি ছিলেন একজন সজ্জন ব্যক্তি। তাঁর মধ্যে একটা প্রেরণার কাজ করতো যে, এই কাজটা করতে হবে এবং আমরা এটা অবশ্যই করবো, আর আমরা তা অব্যাহতভাবে করতে সর্বদা লেগেই থাকবো। যদিও একটা মুক্ত, স্বাধীন, আত্ম-নিয়ন্ত্রিত জাতি হিসেবে তাঁর জনগণের শেষ ফসল তিনি দেখে যেতে পারেননি। সকলকে ধন্যবাদ।

সঞ্চালক: ইয়ান, আপনাকে বেশ ধন্যবাদ। ড. দেওয়ানের প্রতি এমন স্বচ্ছ, যথার্থ শ্রদ্ধাঞ্জলির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। এখন আমরা আমাদের বক্তাদের কাছে চলে যাবো। পার্বত্য চট্টগ্রামের বেশ কিছু সংখ্যক অধিকার কর্মী এবং জুম্ম অংশগ্রহণকারী আছেন যারা এই স্মরণসভায় যুক্ত হয়েছেন।

এখন প্রথমে আমি আহ্বান করতে যাচ্ছি কুমার শিবাশীষ রায়কে। শিবাশিষ, তুমি লণ্ডন-ভিত্তিক এবং যুক্তরাজ্যে জুম্ম পিপলস নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত রয়েছো, যে সংস্থা সবসময় ড. দেওয়ানের সাথে ঘনিষ্ট যোগসূত্রে সম্পৃক্ত ছিল। প্লিজ এগিয়ে যাও।

শিবাশীষ রায়:

ধন্যবাদ দিদি। আমি শিবাশীষ, রাজকুমারী চন্দ্রা কালিন্দী এবং রাজা দেবাশীষ-এর ছোট ভাই। আমার আরো এক ছোট ভাই

এবং ছোট বোন আছে, তাই আমরা সবাই মিলিয়ে পাঁচ ভাই-বোন। আমি বলতে চাই যে, আপনাদের সবাইকে একসাথে একই সময়ে আমার স্ক্রীনে পেয়ে আমি সত্যিই অভিভূত বোধ করছি। আমি আপনাদের সবাইকে নাম ধরে চিনি, কাউকে কাউকে ফটোতে, কাউকে সাদা-কালো, কাউকে রঙিন ফটোতে দেখেছি। কাউকে আবার ফটোতে কখনো দেখিনি তবে নাম ধরে চিনি। আবার আমি চন্দ্রা দিদির কাছে জেনেছি, আপনাদের কাজের বিষয়ে এবং চমৎকার সব কাজ আপনারা সবাই করে আসছেন। আর আমি আশা করবো যে, আপনারা সেসব কাজ করতে থাকবেন। কারণ কাজের মশালটা এখন আমাদেরকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ড. আর এস দেওয়ান, একটা ম্যারাথন দৌড়ে তিনি আটশত মিটার, হতে পারে হাজার মিটার দৌড়িয়েছেন। তিনি একজন দৌড়বিদ। তিনি গত চল্লিশ, পঞ্চাশ বছর ধরে দৌড়ে আছেন আর পাঁচ হাজার মাইল দৌড়ে চলছেন। এখন মশালটা স্পষ্টত আমাদেরকে এগিয়ে নিতে হবে । কারণ, বিশেষ করে পার্বত্য জনগণ আমরা কাউকে আমাদেরকে সাহায্যের জন্য প্রত্যাশায় থাকতে পারি না। পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্তর্জাতিক বন্ধুরা আমাদের জন্যে অনেক করেছেন এবং আশা করি তারা তা করবেন। আর আমরা তাদের এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের আশীর্বাদ, মেত্তা, সহানুভূতির উপর ভরসা করি। তবে অতঃপর সেই কাজটা আমদের উপরই বর্তায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ, যারা সেখানে জন্মেছেন, বেড়ে উঠেছেন, যাদের জনগণের এবং দেশের প্রতি একরকম আনুগত্য আছে, সংগ্রামের মশালটা আমাদেরকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং আমরা অবশ্যই দোলায়মান হবো না। আমরা অবশ্যই এই মশালটা বহনের দায়িত্বটা ছেড়ে দেবো না।

অনেক কিছু করা হয়েছে। ড. আর এস দেওয়ানের মতো উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিবর্গ, আপনাদের মধ্যে অনেকে, অন্য অনেক জুম্ম জনসাধারণ যারা এখানে আমাদের সাথে উপস্থিত নেই, তাদের মাধ্যমে আমরা অনেক অর্জন করেছি। তবে আন্তর্জাতিক সমর্থনের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত স্তরে আমরা এখনো পৌঁছুইনি। আর আমি একটু উল্লেখ করতে পারি যে, আমাদের প্রতি অত্যাচার, আমাদের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের খবরাখবর, আপনাদের সকলের সহানুভূতি, সমর্থন, উদার ব্যক্তিবর্গের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে ছড়িয়ে পড়ার কারণে এবং আন্তর্জাতিক সমর্থনের কারণে অনেকের প্রাণ বেঁচে গেছে। আমি অবশ্যই বলবো, আন্তর্জাতিক প্রচারণা ও সমর্থনের কারণে তারা আমাদের উপর তাদের অনেক অত্যাচার থামাতে হয়েছে অথবা তাদের অত্যাচার-উৎপীড়নের পরিকল্পনা পাল্টে নিতে বাধ্য হয়েছে যা কিনা জনগণের জীবনের প্রতি অত্যন্ত ক্ষতিকারক হতে পারতো। এখানে জীবন বাঁচানোর বিষয়টা ছিল বড় কথা। প্রতিটি জীবন অবশ্যই অতিশয় মূল্যবান।

একটা উদাহরণ নেয়া যাক, কোন একজন উল্লেখ করছিলেন যে, বেশ সংখ্যক লোক ছিল যারা ধ্বংস হয়ে গেছে, অত্যাচারের সংখ্যা কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছিল। আমি যতদূর পড়েছি, যারা প্রাণ হারিয়েছে তাদের সংখ্যা ৮,৫০০ থেকে ১০,০০০ হবে বিভিন্ন উৎস অনুসারে। তবে আমরা সঠিক সংখ্যা জানি না। এটা কেবল সংখ্যা নয়, প্রত্যেক এবং প্রতি সংখ্যার পেছনে এক একজন মানব সত্তা রয়েছে, তা আমাদেরকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে। আর প্রত্যেক হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তি কিংবা দুর্ভোগগ্রস্ত ব্যক্তি, যিনি অত্যাচারের শিকার হয়েছেন এমন মানুষের পেছনে জড়িয়ে রয়েছে অন্য অনেক লোকজন, রয়েছে তার পরিবার, ভাই-বোন, মাতা-পিতা, ছেলেমেয়ে, তারা সবাই সেই একজনের ক্ষতিগ্রস্তের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আমি সম্পূর্ণরূপে মর্মাহত হয়েছিলাম, আর এখনো শোকসন্তপ্ত বোধ করছি, এক প্রকার দুঃখ ভারাক্রান্ত যে, ড. দেওয়ানের মতো একজন সাচ্চা লোককে আমরা হারিয়েছি। আর অবশ্য এক ধরনের অপরাধ-বোধ অনুভব করছি, যেমনটা সফি বলেছেন, যুক্তরাজ্যে থেকেও তাঁর জন্য আমরা বেশি কিছু করতে পারিনি। যদিও আমি জানি যে, তিনি নিজেকে একটু সন্যাসী ধরনের রাখতে পছন্দ করতেন। তিনি সমাজের লোকজনদের সাথে মিশতে বাইরে যেতেন না। হতে পারে, তিনি সেটা সময়ের অপচয় মনে করতেন। আরএকটা বিষয় আমি উল্লেখ করতে চাই, এক ধরনের ভালোই ছিল যে, তাঁর কোন পরিবার ছিল না। তিনি বিয়ে করেননি এবং ছেলে-মেয়ে নেই। এক রকম সেই ভালো। সেটা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত যা তিনি নিয়েছিলেন। তবে অন্যান্য সাধারণ লোকজনের মতো যদি তাঁর পরিবার থাকতো, তাঁর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে থাকতো; আমার মনে হয়, সেক্ষেত্রে তিনি অত সময়, অত প্রচেষ্টা আর সব অর্থ দিয়ে প্রচারনার কাজে উৎসর্গ করতে পারতেন না।

সুতরাং, এটা হয়তো হতে পারে এক ধরনের স্বার্থবাদী কথাই বলছি। তবে এক রকম আমি মনে করি যে, তিনি সেটা আরো গভীরভাবে জানতেন যে, যদি তিনি বিয়ে করে অন্যদের মতো প্রচলিত সামাজিক জীবন-যাপন করতেন, যেমনটা আমরা সবাই পরিবার, ছেলেমেয়ে নিয়ে যে জীবন ধারায় আছি, পরিবার-পরিজনদেরকে দেখভাল করে চলছি, কিন্তু আমি মনে করি, তিনি আমাদের চাইতে অতিরিক্ত মাইল অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। তাঁর জনগণ হয়ে গিয়েছিল তাঁর পরিবার। আমরা তাঁর পরিবারভুক্ত হয়ে গেলাম। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ তাঁর একান্ত আপন পরিবার হয়ে গেল আর তাঁর নিজের

রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়রা হয়ে গেল দূরের এবং আমি যতদূর জানি, সংঘাতে তিনি তাঁর কয়েকজন আত্মীয়কেও হারিয়েছিলেন। আমার মনে পড়ে, সে কথা তিনি আমাকে বেশ কয়েক বার বলেছিলেন।

তিনি পরম ধার্মিক ছিলেন। তিনি একজন বিশুদ্ধ ব্যক্তি, উদার, সাদাসিদে ছিলেন। বিনয়ী, চরম বিনয়ী এবং অহং শূন্য। আমি তাঁর মতো ব্যক্তি কখনো দেখিনি যিনি সম্পূর্ণ অহংশূন্য, কোন গর্ববোধ নেই। তাঁর আলোকপাত ছিল অন্যের উপর। আর যখন তিনি অন্যের উপর আলোকপাত করতেন তখন তিনি নিজের সম্পর্কে ভুলে যেতেন। সে কারণে কনকনে শীতই হোক কিংবা প্রচন্ড ক্ষুধাই হোক সেটা তাঁর কাছে সত্যিই কোন ব্যাপার হতো না। কারণ তাঁর আলোকপাত তাঁর নিজের উপর ছিল না, ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর, জুম্ম জনগণের উপর। তিনি অত্যন্ত আত্ম-প্রত্যয়ী ছিলেন। তাঁর মতো দৃঢ়চেতা লোকই আমাদের প্রয়োজন। কারণ জীবনব্যাপী তাঁর সেই অধ্যবসায়, দৃঢ়তা এবং প্রস্তর কাঠিন্যে ভরা কর্মগুণ সত্যিই একেবারেই চমৎকার, অত্যন্ত বিস্ময়কর!

কয়েকবার তাঁর সাথে আমার দেখা হয়েছিল, বিশেষত আমার লণ্ডনে আসার পর। আমি লণ্ডনে আসি ২০০০ সালে আর তারপর তাঁর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয় লণ্ডনে। আমার তাঁকে স্মরণ হয়, যখন তিনি জানতে পান যে, আমি লণ্ডনস্থ স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ (এসওএএস)-এ বক্তব্য উপস্থাপন করতে যাচ্ছিলাম। তিনি আলোচনা শুনে দারুণ খুশী হয়েছিলেন। সেখানে অন্য জুম্ম বন্ধুরাও ছিল। আমরা সবাই সেখানে গিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তিনি খুশী হলেন এই দেখে যে, বেশি বেশি করে জুম্মারা যুক্তরাজ্যে আসছিল।

তিনি খুবই উদার ছিলেন। এক্ষেত্রে আমি একটা ছোট্ট বিষয় উল্লেখ করতে চাই যে, আমার মেয়েকে ক্রিস্টমাস উপলক্ষে তিনি পাঁচ পাউণ্ড করে পাঠাতেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তি যাঁর প্রতিটি পেনী দরকার। তিনি সামান্য আয়ে চলতেন, আর সেই তিনি কয়েক বছর ধরে ক্রিস্টমাস উপলক্ষে আমার মেয়েকে পাঁচ পাউন্ড করে পাঠাতেন। আর আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি উজ্জয়িনীর মেয়ের ব্যাপারেও তাই করতেন। সুতরাং একজন ব্যক্তি যিনি নিঃস্বার্থ, উদার, চিন্তাশীল, সততার সাথে বলতে গেলে, আমি সত্যিই তাঁকে মিস্ করি। আর আমার আশংকা, দুর্ভাগ্যবশত অন্য কেউ তাঁর কাজ করতে সমর্থ হবেন না। আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে আমি তেমন কাউকে দেখি না যিনি তাঁর মতো অতিরিক্ত মাইল অতিক্রম করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। এই বলে আমি এখানে শেষ করছি। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

সঞ্চালক: অনেক ধন্যবাদ শিবাশিষকে, তাঁর উষ্ণতা এবং উদারতা আর দয়ার্দ্রতা নিয়ে ব্যক্তি রামেন্দুর উপর একটা অতি স্পষ্ট ছবি তুলে ধরার জন্য, তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সেই সাথে এটা একটু বলা যে, শিবাশীষ হলো আমাদের গোপন অস্ত্র; আমরা কেবল উপলক্ষক্রমে তাকে বের করি। অন্যথায়, সে তাঁর কাজই করে আসছে। আর আমরা সেই আশাই করছি, অবশ্যই যুক্তরাজ্যে সেভাবেই কাজ চলতেই থাকবে। যুক্তরাজ্যে সে আবার জুম্ম পিপলস নেটওয়ার্কেরও একজন সদস্য আর তারাই হল যুক্তরাজ্যে চলে আসার ক্ষেত্রে সামনের সারিতে, অবশ্য অন্যত্রও আছে। তোমাকে ধন্যবাদ।

এখন আমরা চলি, নীচে, অস্ট্রেলিয়ায়। আমি সম্মানের সাথে আহ্বান করছি বিনোতাময় ধামাইকে। তিনি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কর্মব্যবস্থা-এর একজন বিশেষজ্ঞ সদস্য। আর তিনি তাঁর পিএইচডি অস্ট্রেলিয়ায় করছেন। বিনোতা, আপনি কিছু কথা বলবেন কি?

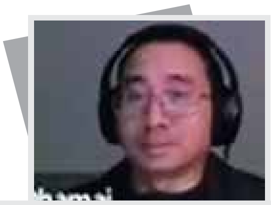

বিনোতাময় ধামাই:

ধন্যবাদ দিদি, চন্দ্রাদি। আয়োজকদের প্রতিও ধন্যবাদ ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ানের উপর কিছু কথা শেয়ার করতে সুযোগ দানের জন্য। আমি আসলে বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে শুনবো বলে এখানে উপস্থিত আছি, যাঁরা ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে আসছিলেন। কারণ আমি তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনেছি। তাঁর সাথে দেখা করে আন্তর্জাতিক প্রচারনা সম্পর্কে কিংবা জুম্ম জনগণের জন্য কাজ করার বিষয়ে কিছু পাঠ নিতে পারি, আমার সেই সুযোগ কখনো ছিল না। তবে আজকে আমি এসেছি জ্যেষ্ঠদের কাছে শুনতে, যেমন তাঁর সহকর্মী উল্ফগ্যাং মে থেকে এবং জেনেকে এরেন্স থেকেও, যাঁদের কাছে তাঁর সম্পর্কে বহু কিছু শুনেছি। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর তাঁদের গবেষণাকর্ম থেকে অনেক দলিল পড়েছি এবং ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ানের উপর আরো অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চেয়েছি ড. আদিত্য কুমার দেওয়ান, এলসা স্ট্যামেটোপৌলো এবং অন্যান্যদের থেকেও।

আমার দৃষ্টিকোণ থেকে আমি যা শেয়ার করতে পারি তা হল, পার্বত্য চট্টগ্রামের নির্বাক জনগণ, নির্বাক জুম্ম জনগণের যাদের কণ্ঠ আন্তর্জাতিক স্তরে শোনানো প্রয়োজন ড. আর এস দেওয়ান ছিলেন সেই ব্যক্তি। আন্তর্জাতিক স্তরে যোগাযোগ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা এবং বন্ধু ও মানবতাবাদী সম্প্রদায়ের কাছে পৌছার সেতু রচনার ক্ষেত্রে তিনি নিশ্চায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন, আর তা তিনি

সফলভাবে করেছিলেন। আমার চন্দ্রাদির কথাটা স্মরণ হয়, দেখা হলে প্রায়শই শেয়ার করতেন। এমনকি তিনি যখন জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের সেক্রেটারিয়েটের প্রধান হন আর যখন অনেক সময় স্থায়ী ফোরামের সেশনগুলোতে আমি উপস্থিত থাকতাম, যে কথা তিনি একটু আগেও উচ্চারণ করেছিলেন, 'খেয়ে কোমর শক্ত করো।' এটা দিয়ে তিনি প্রায়শই বোঝাতেন 'কিছু খেয়ে শক্তি সঞ্চয় করে নিতে, কারণ তোমার কাজ করতে শক্তি দরকার'।

আর সেটাই হল, একজন ব্যক্তির প্রেরণা, দর্শন যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে হস্তান্তরিত হয়েছিল। ড. দেওয়ান সবসময় চিন্তা করতেন, এধরনের প্রচারনা কর্মকাণ্ড নিশ্চিত করার জন্য একজন অধিকার কর্মীকে কি ধরনের হওয়া উচিত। আর সেটাই তিনি হস্তান্তরিত করেছিলেন, সেই জ্ঞান এবং বাণী। এটা সরল সাধারণ, তবে খুবই অর্থবহ এবং শক্তিশালী। এটাই চন্দ্রাদি প্রায় সময় স্থায়ী ফোরামের সেশনে দেখা হলে বলতেন।

আরও একবার অভিজ্ঞতার শেয়ারিং হয়েছিল, ফিলিপাইনের বাগুইও সিটিতে অনুষ্ঠিত এশিয়া-পেসিফিক রিজিওন্যাল প্রিপ্যারেটরী মিটিংয়ের পর চন্দ্রাদি, লোলা ও আমি ব্যাঙ্কক ফ্লাইটের জন্য বাগুইও সিটি থেকে ম্যানিলা যাচ্ছিলাম, যেখান থেকে লোলা কোপেনহেগেন চলে যাবেন। আমাদের জার্নির সারা রাস্তা ধরে আমরা আমাদের পরিস্থিতি আলোচনা করছিলাম। আদিবাসীদের আন্দোলন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আন্দোলন আর অন্তর্জাতিক অঙ্গণে প্রচারাভিযান ও প্রচারনার ক্ষেত্রে ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ান যে ভূমিকা পালন করে আসছিলেন তা আলোচনা করছিলাম। চন্দ্রাদির অভিজ্ঞতা, ড. দেওয়ানের সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ, জেনেভায় আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ-এর অধিবেশনে ড. রামেন্দ্র শেখর দেওয়ান কর্তৃক কিভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন সেকথা। সেটা সত্যিই বড় রকমের অভিজ্ঞতা শেয়ারিং ছিল এবং সেটা ছিল অত্যন্ত সংজ্ঞায়িত চিন্তাধারা যা আমার মধ্যে গ্রোথিত হয়েছিল যে, একজন এ্যাক্টিভিস্টের পক্ষে কিভাবে আন্তর্জাতিক স্তরে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়া উচিত।

সুতরাং জ্যেষ্ঠরা ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ানের আন্দোলনের কথা আগেই উল্লেখ করেছেন, কিভাবে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয়গুলো শেয়ারিংয়ে অবদান রেখেছিলেন, মূল বিষয় জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্যে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়ন নির্ধারণ করার লক্ষ্যে সংগ্রাম করেছিলেন। আমিও অবশ্যই বলবো যে, ড. আর এস দেওয়ানের প্রচারাভিযান তখনই পরিপূর্ণ হবে, যখন প্রকৃতপক্ষে বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন ঘটবে। আমি বলবো যে, এ মুহূর্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন হলে তাঁর স্বপ্ন কিছুটা হলেও পূর্ণতা পাবে। কেন আমি তা বলছি তার কারণ হলো, আমি চুক্তিটা পড়তে গিয়ে দেখলাম তাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জুম্ম জনগণকে কিছুটা হলেও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এতে সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে যে পাওয়ার-শেয়ারিং মেকানিজম আছে তাতে করে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণ 'আদিবাসী জাতি' হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বেঁচে থাকতে পারবে।

এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে, আপনারা অনেকে আপনাদের গবেষণা কর্মে এবং জুম্ম জনগণের ইস্যুতে ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে যে অবদান রেখে চলেছেন, তা কিছুটা হলেও পূরণ হবে যদি চুক্তিটা সত্যিই যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপটে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বিষয়ে আমি এভাবেই দেখি। আমি আর সময় নেবো না। আজকে এখানে আমি একটু প্রস্তাব রাখবো। আপনারা, জ্যেষ্ঠরা যারা ড. রামেন্দু শেখরের সাথে কাজ করেছেন, আপনাদের কাজ করার স্মৃতি থেকে লেখা প্রবন্ধের সমন্বয়ে যদি 'স্যুভেনির' বা সেজাতীয় একটা কিছু প্রকাশনা প্রকাশ করতেন, তাহলে যুব প্রজন্মের পক্ষে তাঁকে বুঝতে বিরাট সহায়তা হতো। এ মুহূর্তে এটাই আমার প্রস্তাবনা আর ড. দেওয়ানের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন জানিয়ে এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। তাঁর শান্তির প্রার্থনা করছি। এখানে বলার সুযোগ দানের জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

সঞ্চালক: বিনোতা, আপনাকে ধন্যবাদ। আর অবশ্যই, যেমনটা বিনোতা বলছিলেন, ড. দেওয়ান আমাদের সবাইয়ের কাছে সদাসর্বদা প্রেরণা হয়ে থাকবেন, এবং আমি নিশ্চিত যে, তিনি অন্যদের এবং অন্যান্য এ্যাক্টিভিস্টদের যারা প্রচারকার্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন তাদেরকে প্রেরণা যোগাবেন। এখন আমরা ফিরে যাবো লিমোনা চান্দার কাছে। তিনি নারী ইস্যু ও উন্নয়ন বিষয়ে কাজ করেন। লিমোনা, তোমার কাছে মাইক্রোফোন। প্লীজ এগিয়ে যান। হতে পারে, আপনি যদি নিজের পরিচয়টাও একটু তুলে ধরেন, তখন আমরা জানবো যে আপনি কে। তিনি হলেন, আমাদেরই একজন উদিয়মান যুব অভিযাত্রী।

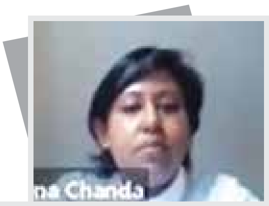

লিমোনা চান্দা:

ধন্যবাদ, চন্দ্রাদি। জু, জু, প্রত্যেককে। প্রত্যেককে গুড ইভনিং। আমার নাম লিমোনা চান্দা। আমি একজন ব্যারিষ্টার

এবং একজন লিঙ্গ সমতা ও উন্নয়নকর্মী। আপনারা অনেকে আমাকে চিনতে পারবেন না। পার্বত্য চট্টগ্রামে আমার কাজ হল, টেকসই উন্নয়ন এবং সাধারণভাবে নারী অধিকার ও শিক্ষার উপর আলোকপাত করা। মোনঘর নামক একটা স্থানীয় স্কুলে একদল মেয়ের পরামর্শকের কাজ দিয়েই আমার যাত্রা শুরু। আজকে আমি এখানে উপস্থিত আছি, আমার দাদু, ড. আর এস দেওয়ানের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করতে, যিনি এ বছর আমাদেরকে শোকে ভাসিয়ে চলে গেছেন। যুক্তরাজ্যে মাত্র ১৬৩ কিলোমিটার দূরে থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সাথে দেখা করতে পারিনি। তাই আমি তাঁর সম্পর্কে যৎসামান্য যা জানি, যা জানতে পেরেছি সেটাই শেয়ার করবো।

আমার পটভূমি বিচারে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য খুব ছোটবেলা থেকেই আমার কৌতুহল শুরু হয় যখন আমি গল্প শুনতাম আদিবাসী মেয়েদের প্রতি অন্যায় করার কথা। এসব বলতেন বাবা যিনি ১৯৮০'র দশকের শুরুতে পুলিশ অফিসার হিসেবে সেই অঞ্চলে কাজ করতেন এবং সেটাই আমাকে আজকের এই অবস্থানে চালিত করেছিল। প্রথমে আমি ড. আর এস দেওয়ান এবং তাঁর কাজ সম্পর্কে জানতে পাই আমার শ্বাশুড়ি শুক্লা দেওয়ানের কাছে, যিনি আত্মীয়সূত্রে তাঁর ভাতিজী হন। আমার শ্বাশুড়ি হলেন তাঁর বড় ভাইয়ের মেয়ে। আমার শ্বাশুড়ির মাধ্যমে তাঁর জীবন এবং ব্যক্তি হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন সে সম্পর্কে এক ঝলক অবগত হয়েছি।

আমি জানতে পারলাম, তিনি একজন দরদী এবং সত্যিকারের একজন শিক্ষক ছিলেন। তাঁর চিন্তা তাঁর সময়ের আগে চলতো। তিনি মেয়েদের শিক্ষায় এবং নারী বিষয়ে বিশ্বাসী ছিলেন যেজন্যে আজও আমরা যুদ্ধ করছি। তিনি তাঁর ভাতিজীদেরকে শিক্ষিত হতে উৎসাহিত করতেন। আমি একটা সত্য বলে জানি যে, তিনি চাইতেন আমার শ্বাশুড়ি তাঁর গ্র্যাজুয়েশন সম্পূর্ণ করুন এবং যুক্তরাজ্যে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা চালিয়ে যান। শ্বাশুরী যখন ছোট্ট ছিলেন তিনি তাঁকে তাঁর স্বপ্ন পূরণে উৎসাহিত করতেন এবং তাঁকে সেজন্য 'গিফ্‌টস' দিতেন। একটা গিফ্‌টস শ্বাশুড়ি স্মরণ করেন আর সেটা ছিল একটা বই, নাম 'ছবিতে পৃথিবী'। এটাই ছিল তাঁকে পৃথিবী সম্পর্কে পরিচিত করার উনার পদ্ধতি এবং সাহসী অভিযান যা বইটাতে আছে। তাই তিনি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন, তিনি তাঁর ভাতিজীদের সাথে চিঠিতে যোগাযোগ রাখতেন এবং প্রতিত্তুরে শুধরিয়ে দিতেন যদি কোন ভুল থাকতো। তিনি লাঞ্চের পর ভাতিজীদেরকে অংকের প্রশ্ন দিয়ে অনেকক্ষণ সময় ব্যয় করতেন। তিনি খুবই সচেতন এবং নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন এবং আমার বিশ্বাস, তিনি তাঁর প্রতিটি কাজের মাধ্যমে সেভাবে শিক্ষাদান এবং ক্ষমতায়ন করছিলেন।

আমি জানতে পেরেছি যে, আমার শ্বাশুড়ি যখন পড়তে শিখেছিলেন, তাঁকে তিনি পুরষ্কার দিয়ে উৎসাহিত করতেন যাতে করে আদিবাসী দক্ষতা এবং কারিগরীবিদ্যা বজায় রাখেন, যা আজ হুমকির মুখে অপসৃয়মান হয়ে যাচ্ছে। সেরকম অনেক গল্প আছে যা আমি শুনেছি, যে ক্ষেত্রে তিনি সুবিধাবঞ্চিত ছাত্রদেরকে সাহায্য করতেন। তিনি তাদেরকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতেন যাতে তারা তাদের পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারে। আমরা জানি যে, তিনি কখনো বিয়ে করেননি তবে আমি জানতাম তিনি তাঁর ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণ করতে চাইতেন এবং চাইতেন পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল উন্নতি লাভ করুক। এখনো যুব প্রজন্ম আর এমনকি আমার মতো লোকেরা, আমার নৃতাত্ত্বিক পটভূমির পরিচয়ে আমি বাঙালি, এই মহান ব্যক্তি সম্পর্কে এবং তিনি যা করেছিলেন সেসম্পর্কে আমরা যথেষ্ট জানি না। যিনি মূলত তাঁর পুরো জীবন উৎসর্গ করেছেন গবেষণা ও প্রচারনায় এবং তাঁর সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নের কাজে।

আদিবাসী জনগণের প্রতি বাঙালিদের বৈরিতা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন এবং প্রায় সময় সে বিষয়ে কথা বলতেন। আদিবাসীদের প্রতি বাঙালিদের অভিপ্রায় এবং আচরণ আমাকে ব্যথিত করে তোলে, যা এই দেশের গত পঞ্চাশ বছরেও পরিবর্তন হয়নি। বাস্তব সত্য এই যে, এই অঞ্চলে বাঙালি বসতির পর, যখন আদিবাসীরা জোরপূর্বক পাহাড়ে সরে যেতে বাধ্য হয়, আমরা এমনকি তাদেরকে 'পাহাড়ি' নামে ডাকতে বা লেবেল দিতে শুরু করি যা উপযুক্ত শব্দ নয়। এটা বরং সেই সম্প্রদায়ের প্রতি অবমাননাকর। সুতরাং বাংলাদেশের আদিবাসী সম্প্রদায় নিশ্চিতরূপে দেশের আদিবাসী হিসেবে যোগ্য স্বীকৃতি পায়নি। আর সেজন্য তাদের অধিকার, সংস্থা এবং ক্ষমতার অভাব রয়ে গেছে।

কয়েক মাস আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে দুর্ভিক্ষ, তীব্র পানিসংকট, হামের প্রাদুর্ভাবে শিশু মৃত্যু হয়েছিল আর এসব ঘটনা বিরাটভাবে মানব জীবনে অভিঘাত হানার উদাহরণ আর দুঃখজনক ব্যপার হলো, এসব দুর্দশা সম্পূর্ণভাবে এড়ানো যেতো। কর্তৃপক্ষের অতি অবহেলাই এসব ঘটনা ঘটেছিল। আজ আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আলোচনা করছি, এখনো আদিবাসীরা নাগরিক হিসেবে মৌলিক অধিকার পায়নি। বাঙালি কর্তৃক খোলামেলাভাবে ঘৃণাপ্রসূত বক্তব্য শেয়ার করা হয়, মিডিয়ায় তাদের বিরূপ চিত্র ছড়ানো হয়, আর সর্বোপরি বাঙালিদের মধ্যে সচেতনতা এবং গ্রহণযোগ্যতা লক্ষ্যনীয়ভাবে অভাব রয়েছে। আমি নিশ্চিত যে, সেই আমাদের মধ্যে আজকে যারা এখানে উপস্থিত আছি তারা আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতি অন্যায় সম্পর্কে জ্ঞাত আছি। সে বিষয়ে আমি অধিক বিস্তারিত উল্লেখ করবো না। যা হোক, এই মহান আত্মা আর এস দেওয়ানের স্মরণে, যিনি আমাদের মাঝে ছিলেন, আমি আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই, তাঁর প্রয়াত আত্মার জন্য সম্ভাব্য সবসামর্থ দিয়ে প্রার্থনা করি এবং তাঁর অসমাপ্ত স্বপ্ন

বাস্তবায়ন করি। আর সেটা অসমাপ্ত কাজ হলো, পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটা উন্নত অঞ্চলে পরিণত করি যেখানে জনগণ তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে না।

একজন লিঙ্গ সমতা এবং উন্নয়ন কর্মী হিসেবে, আদিবাসী নারীর অধিকার, শিশু শিক্ষা এবং সর্বোপরি টেকসই উন্নয়ন এবং অঞ্চলের কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করতে আমি প্রতিজ্ঞা করি। এই মহান আত্মার প্রতি সেটাই হবে আমার সম্মান জ্ঞাপন। চন্দ্রাদি, আপনি এই বলে শুরু করেছিলেন যে, আজকে আমরা একটা শোকবহ কারণে একত্রিত হয়েছি। আমি যোগ করতে চাই, হতে পারে আমরা আজকে শোকবহ কারণে একত্রিত হয়েছি, তবে আশাকরি, এই সামষ্টিক প্রচেষ্টা আমাদেরকে সৃজনশীল এবং বৃহত্তর ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণে সাহায্য করবে। আমি তাঁর আত্মার জন্য আমার প্রার্থণাপূর্বক এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমি আশাকরি, তাঁর আত্মা শান্তিতে শায়িত থাকবেন। প্রত্যেককে ধন্যবাদ।

সঞ্চালক: অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। জুম মিটিং-এর মাধ্যমে আপনার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া সত্যিই ভালো লাগছে। আমি নিশ্চিত যে, অন্যদের মধ্যেও কেউ কেউ, আমরা আপনার ব্যাপারে অজ্ঞাত ছিলাম, এবং আমি মনে করি, আপনি এই বিষয়ের প্রতি একজন বিরাট অবদানকারী হতে পারেন। আর এটা জানতে পাওয়া বেশ ভালো যে, আপনি প্রকৃতপক্ষে ড, আর এস দেওয়ানের আত্মীয় সম্পর্কিত। শেষ পর্যন্ত আমরা কাউকে পেলাম যার শ্বাশুড়ির মাধ্যমে কিছু আত্মীয়তা আছে। আমরা উষ্ণ স্বাগতম জানাই, আর আমরা আপনার থেকে আরো শুনবো এবং আরো অধিক কাজ আমাদের জন্য করবেন তার প্রত্যাশায় থাকবো। ঠিক আমাদের জন্য নয়, আপনারই লোকেদের জন্যে। কেননা আপনি আমাদেরই একটা অংশ। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

ড. মেসবাহ কামাল: ইন্টারনেট বিপত্তির কারণে তিনি কথা বলতে সক্ষম হননি।

গৌতম কুমার চাকমা:

ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ানের উপর আমার আলোচনা শুরু করার আগে আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং প্রার্থনা করছি যেন পরজন্মে তাঁর উন্নত জীবনলাভ হোক।... (ইন্টারনেট বিপত্তির কারণে তিনি আলোচনা চালিয়ে যেতে পারেননি।)

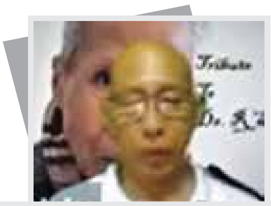

প্রধীর তালুকদারের সমাপনী বক্তব্য:

আজকে আমরা শুধু যে গর্বের সাথে ড. আর এস দেওয়ানকে স্মরণ করছি তা নয়, শুরু থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে যারা জড়িত ছিলেন, তাদের মধ্যে আজও জড়িয়ে আছেন এমন কেউ কেউ আমাদের মাঝে এখানে উপস্থিত আছেন, তাদের প্রতি আমরা আমাদের সর্বোচ্চ সম্মান জ্ঞাপন করি এবং সম্মান জানাই যুক্ত থাকা সব সংস্থার প্রতি, যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুকে আন্তর্জাতিক অঙ্গণে সামনের সারিতে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন এবং আজও অনেক সাহায্য প্রদান করে চলেছেন।

এখানে আমি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা এবং ভালবাসা জানাই জেনেকে, ড. উল্ফগ্যাং মে-এর প্রতি। ঘোর সামরিক শাসনের দিনগুলোতে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের পার্বত্যাঞ্চল সফরের সময় তাঁদের সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখা করেছিলাম। ঢাকা থাকাকালীন সময়ে জেনেকে'র গুরুত্বপূর্ণ সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করছি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং এন্টিস্লেভারী সোসাইটি, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, সার্ভাইভাল ইন্টারন্যাশনাল, পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন, ইউএনপিও ইত্যাদি সংস্থা সকলের প্রতি আমরা আমাদের অকৃত্রিম প্রশংসা জানাই।

বছরের পর বছর ধরে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায়ের কাজ সম্পন্ন করার জন্য তাঁরা তাঁদের জোরালো প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কার্যত তাঁদের পরিচালিত আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং অশেষ সমর্থন, বিশাল কাজের বহর তাঁরা সম্পন্ন করেছেন তা বলে শেষ করা যাবে না। আপনাদের কাজের ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতি এত বেশি মনযোগ আকৃষ্ট হয়েছে।

আমাদের মূল সমস্যার ক্ষেত্রে আপনাদের অশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করার জন্য এবং নির্যাতিত জাতি হিসেবে আমাদেরকে কথা বলার একটা প্ল্যাটফরম সমবেত করার জন্য আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানাই। আমরা চাই যে, আপনারা জানুন যে, আমরা আপনাদের অক্লান্ত প্রচারণা ও সমর্থন ভুলিনি। আর তাই আমাদের মূল সমস্যার প্রতি সহৃদয় সমর্থক এবং বন্ধু হিসেবে এই সুযোগে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই। পরিশেষে, এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ।

_* ইংরেজি অনুলিখন করেছেন সুস্নিগ্ধ তালুকদার পিংগুলো। তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে।_

পার্বত্য চট্টগ্রাম
মানবেন্দ্র নারায়ণ
ও জুম্ম জা
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি স
শ্রদ্ধাঞ্জলি
শ্রদ্ধাঞ্জলি
শ্রদ্ধাঞ্জলি
শ্রদ্ধাঞ্জলি
শ্রদ্ধাঞ্জলি
শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রদ্ধাঞ্জলি

লন্ডন প্রবাসী জুম্মদের উদ্যোগে গত ১৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে ইংল্যান্ডের বার্মিংহ্যাম শহরের একটি বার্মিজ বৌদ্ধ মন্দিরে ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ানের অন্তোষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

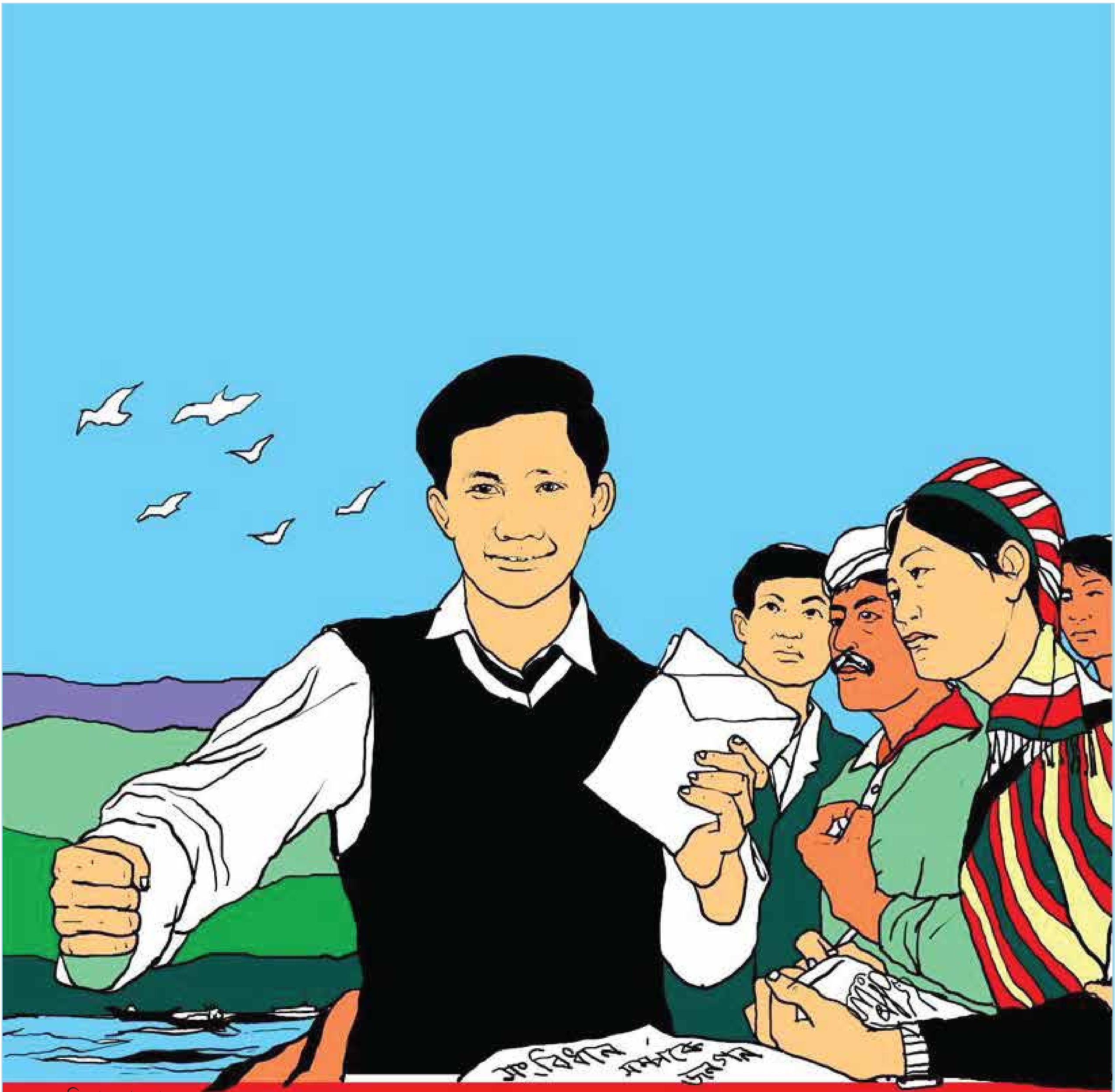

অঙ্কনে: তিতাস চাকমা

> আজকে খসড়া সংবিধান যদি এই গণপরিষদ-এ এইভাবে গৃহীত হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার যে আপত্তি আছে, সে আপত্তি হল, আমার বিবেক, আমার মনের অভিব্যক্তি বলছে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা পুরোপুরি এই খসড়া সংবিধানে নাই। যদি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা এই সংবিধানে থাকত, তাহলে আমার আপত্তির কোন কারণ থাকত না।
>
> —*মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত
ফোন: +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮, ই-মেইল: pcjss.info@gmail.com, ওয়েব: www.pcjss.org

শুভেচ্ছা মূল্য : ১০০ টাকা